নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—প্রাপ্তিস্থান—

প্রগতি প্রকাশনী

১৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৫২

প্রকাশক :

রঘুনাথ আঢ্য

এস, সি, আড্ডি এণ্ড কোং লিঃ

১২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর :

মহাদেব চন্দ্র ঘোষ

নরেন্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৮৮, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

শৈল চক্রবর্তী

দাম—দু' টাকা

নির্যাতন ও কারাবাস যাঁর বিদ্রোহী প্রাণকে অবদমিত করতে পারেনি, সেই অক্লান্ত দেশকর্মী—

মেজদা

শ্রীশেখর নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-কে

"আসে রাত্রি মহা-বিপ্লবের,
মশাল জ্বালায়ে রাখো ঘরে ঘরে দৃপ্ত জীবনের।"

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

—এক—

মহকুমা সহরের দুটি প্রবেশ-পথ।

একটি বেরিয়েছে আঠারো মাইল দূরের [illegible]-ইষ্টিশন থেকে। ইষ্টিশনটিও ছোট নয়—প্রকাণ্ড বন্দর, বিখ্যাত গঞ্জ। লাল কাঁকর-ফেলা রাস্তা, ব্যবসায়ীদের বড় বড় বাড়ি। থানা আছে, সার্কল-অফিসারের আস্তানা আছে। চালের কলের পুঞ্জীভূত ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন, সার্ভিস লাইনের বড় বড় মোটর-বাস গতায়াত করছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

বড় ইষ্টিশন। ফার্ষ্ট-ক্লাস ওয়েটিং-রুম আছে, ডেক-চেয়ার আছে, এমন কি টানা-পাখা অবধি আছে,—যদিও তার মাদুরের আধখানা কোণাকুণিভাবে ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। বিবর্ণ বার্ণিশ-ওঠা প্রসাধনের টেবিলে একখানা ফর্সা টার্কিশ তোয়ালে আর এক টুকরো সাবান সযত্নে সজ্জিত থাকে, সাহেব-সুবো বা অফিসারেরা কেউ এলে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার জন্যে। তবে তাঁরা কেউ অবশ্য ওই সাবান কিংবা তোয়ালে ব্যবহার করেন না, আর্দালীরা গায়ে মাথে অথবা বিলিতি কুকুরকে স্নান করায়। ষ্টেশন-মাষ্টার তাতেই কৃত-কৃতার্থ।

এই লাইন দিয়ে দু'খানা মেল ট্রেণ চলে। একখানা আসে আসামের পাহাড়ের বুকে ঘন-গর্জিত ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আর একখানা নেমে

আসে সাপের কুণ্ডলীর মতো হিমালয়ের 'লুপ' ঘুরে ঘুরে। একখানা চলে দিনে, আর একখানা নিশাচর। দিনের গাড়িখানা থামে না, একটা বিশাল বন্যজন্তুর মতো প্রচণ্ড গতির ছন্দে নিশ্বাসের কালো বিষ ছড়িয়ে উড়ে যায় দিগন্তে—অনেকক্ষণ ধরে থর থর কাঁপতে থাকে দরজা-জানালার কাচের শার্সীগুলো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ষ্টেশনের কুলি সবুজ পতাকা দুলিয়ে তার স্বচ্ছন্দ গতিপথের নির্দেশ দেয়।

রাত্রের গাড়িখানা আসে নিশুতি প্রহরে—কাল-পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তিটা যখন উদয়াস্তের কেন্দ্রপথে—ঠিক সেই সময়ে। চালের কলের কালো চিম্‌নিগুলো তখন স্তব্ধ ছায়ামূর্তির মতো নিরালা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে—আর এখানে ওখানে দপ্‌ দপ্‌ করছে দু'-চারটে ইলেক্‌ট্রিকের আলো। বহু মানুষের উদ্বিগ্ন কোলাহলে ইষ্টিশন মুখরিত হয়ে ওঠে। ঘট্—ঘট্—ঘটাং। লাল সিগন্যাল সরে যায়—সবুজের সংকেত জানায় সাদর আহ্বান। তার পরে আলোর শুভ্র রশ্মি-আভায় দিগন্তের কালো অরণ্য আর তমসাবৃত আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—সার্চ লাইটের জোরালো আলোয় লাইনের ইস্পাত যেন ঝলসে ওঠে দুটো সরীসৃপের মতো. কোথা থেকে একটা আগ্নেয় তীর উড়ে এসে বিঁধে যায় এখানকার পাথর-ছড়ানো প্ল্যাটফর্মে। মাত্র এক মিনিট। তবু ওই এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর বার্তা পৌছিয়ে দিয়ে যায়। খবরের কাগজ নামে, নামে ডাকের ব্যাগ। আবার ঘট্—ঘট্—ঘটাং। ষ্টার্টারের ইঙ্গিত পড়ে,—আগ্নেয় তীরটা আবার নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চিত অন্ধকারের কক্ষবদ্ধ লক্ষ্য বিন্দুর দিকে।

আস্তে আস্তে রাত শেষ হয়। ভোরের আভাসে ঘনীভূত তমসা

জোলো কালির মতো ফিকে হয়ে আসে। ইষ্টিশনের এখানে ওখানে যে সব পশ্চিমা কুলি নিঃসাড়ে পাগড়ির মলিন গামছাটা মাথার তলায় দিয়ে ঘুমিয়েছিল, তারা উঠে পড়ে একে একে। এবার কোলাহল শোনা যায় ইষ্টিশনের বাইরে।

ভোঁপ—ভোঁপ—ভোপ' বাস সাড়া দিয়েছে। বাসের ছাতের ওপরে লাল-রঙের একটা মস্ত লোহার বাক্স, রয়্যাল্ মেল তোলা শেষ হয়েছে তাতে। এবার প্যাসেঞ্জারেরা ইচ্ছে করলে উঠে আসন নিতে পারে।

ষ্টেশনে যে-সব যাত্রী পোটলা-পুটলি আর টিনের স্যুটকেশ মাথায় দিয়ে ঝিমুচ্ছিল, তড়াক্ করে উঠে বসে তারা। তার পর আর এক দফা মল্লযুদ্ধ। ওঠ—ওঠ—ওঠ। ওরে বাপু, মালটা তুলে দে না ছাতের ওপর। কী বলছেন মশাই, এই ছোট স্যুটকেশটা রাখতে পারব না সীটের নীচে? না—না, প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে হবে কেন? এখানে আর কোথায় লোক নেবে দাদা, দম আটকে মারবে নাকি শেষ পর্যন্ত? যাও—যাও—ওই দু'আনাই ঢের দিয়েছি, আর জুলুম করো না। আমার হাঁড়িটা একটু দেখবেন স্যার—লাথি-টাথি মারবেন না, কালীঘাটের প্রসাদ আছে ওতে। আরে—রহমান সাহেব যে! আবার এখানেই বুঝি পোষ্টেড হয়ে এলেন? এই বিড়ি পান, চার পয়সার খিলি পান দে যাও। ভোঁদা যদি আবার ছটফট্ করবি—তা হলে এক চড়ে কান ছিঁড়ে দেব। ওগো, ঘিয়ের বোয়ামটা নীচে দিতে বলো, ওপরে দিলে ওতে আর বস্তু থাকবে না। বাপধন ড্রাইভার—আর ভেঁপু বাজিয়ো না দয়া করে, গাড়িটা এবারে ছাড়ো, দম আটকে যে গেলাম!

পাঞ্জাবী ড্রাইভার পেছনের দিকে মুখ ফেরায়। দু'টো বিশ্লেষণী চোখের দৃষ্টির সাহায্যে অনুমান করে নেয় যাত্রীদের অবস্থা অন্ধকূপ-হত্যার ঠিক পূর্বাধ্যায়ে পৌছেছে কি না। তার পর হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করেঃ এ ইন্দুরবাবু, সব টিক আছে?

ইন্দুর বাবু অর্থাৎ ইন্দ্রবাবু বাসের কণ্ডাক্‌টার। পাঞ্জাবী প্রোপ্রাইটরের স্বল্প বৈতনিক কেরাণী। শুকনো ইঁদুরের মতোই চেহারা, রোগা মুখের লম্বা লম্বা বিশৃঙ্খল গোঁফগুলো দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে। সেলুলয়েডের কালো ফ্রেমে আঁটা গোল চশমাটা মুখের ওপরে কেমন বেমানান বলে মনে হয়।

ইন্দুর বাবুর তখন গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা। বাস্ ছাড়বার আগেই যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়ার টাকা পয়সা আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু নিজের কীর্তির কৃতিত্বে ইন্দুর বাবু ত্রিশঙ্কুত্ব লাভ করেছেন। তারস্বরে চীৎকার করে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি—এই যে চলল বাস নিশ্চিন্ত নগর, একদম খালি গাড়ি—

আহ্বানে আশার অতিরিক্ত সাড়া মিলেছে তার। মুরগীর খাঁচার মতো বাসে বোঝাই হয়েছে খালি গাড়ির প্রলুব্ধ যাত্রীদল। তার ভেতর দিয়ে পথ করে অগ্রসর হচ্ছেন ইন্দুর বাবু। কিন্তু অগ্রসর? কখনো শূন্যে ঝুলে, কখনো যাত্রীদের হাঁটুর তলায় হামাগুড়ি দিয়ে, আবার কখনো বা হাতাহাতি যুদ্ধের নীতিতে। বিকচ্ছ অবস্থা, বস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত পেছনের একটা টিনের স্যুটকেসের হ্যাণ্ডেলে লটকে আছে। যেন স্রোতে মুখে উদ্দাম নৌকো বাঁধা পড়েছে নোঙরে।

—আপনার ভাড়াটা দাদা—শুনছেন—

দাদা অনুজের দিকে ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে তাকালেন।

—ভাড়া যে দেব মশাই হাত বের করবার জায়গা রেখেছেন? বলি আমাদের কি শূয়োর-ভেড়া পেয়েছেন যে এমনি করে গাদাচ্ছেন একসঙ্গে?

ইঁদুর বাবুর গাল দিয়ে টস টস করে ঘাম পড়ছে। দু'দিকের চাপে চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, ইন্দুরের মতো মুখখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছুঁচোর মতো। বললেন, কী করবেন দাদা, সবাইকেই তো যেতে হবে—

—এই ভাবে যেতে হবে! কিন্তু তা হলে আর পৌঁছুতে হবে না,—গাড়িতেই—আর একজন রসিক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন, একেবারে বৈতরণী পেরিয়ে যেতে হবে। নিশ্চিন্ত নগর নয়, নিশ্চিন্তপুর—

চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বিনয় করেও ইন্দুর বাবুর হাসবার অবস্থা নয়। তবু বড়লোকের ছেলে গরীবের বাড়ীতে পাত্রী দেখতে এলে মেয়ের বাপ যেমন করে একটা প্রাণান্তিক হাসি হাসে, তেমনি করে একটা মোহিনী হাসি হাসবার চেষ্টা করলেন ইন্দুর বাবু: গাড়ি ছাড়লেই একটু ঠাণ্ডা লাগবে, হাওয়া আসবে কি না।

—কিন্তু হাওয়া আসবারও তো একটু জায়গা চাই মশাই।

কাছায় এমন টান পড়েছে যে, নৌকোর নোঙর বুঝি ছেঁড়ে। এক হাতে সেটাকে টানতে টানতে সামনে ড্রাইভারের আসনের দিকে বাঁকা চোখে তাকালেন ইন্দুর বাবু।

—কী করব দাদা—চাপা-গলায় ফিস্‌ফাস করে বেরিয়ে এল বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর: ওই ড্রাইভার ব্যাটা—ওরাই তো মালিক। ওরা যত লোক চাপাতে বলবে তত চাপাতে হবে। আমরা মাইনের চাকর—

—দাড়ি উপড়ে দাও ড্রাইভারের।—একজনের সরোষ মন্তব্য, কিন্তু সজোর নয় : আমরা মানুষ নই না কি ?

রসিক ভদ্রলোকটি বললেন, আপনারা প্যাসেঞ্জার। প্যাসেঞ্জার আর মানুষের ডেফিনিশন আলাদা মশাই—ট্রেণে দেখতে পান না ?

—আইন বলেও তো একটা জিনিষ আছে। টু সীট্ সিক্সটিন—কিন্তু এ কী !

—আইন ! এবারে এত দুঃখেও হাসলেন দাদা।

ভোঁপ—ভোঁপ। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভেঁপু। সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা অনিবার্য শারীরিক নিয়মে ইন্দুর বাবুর গলা থেকে বাঁধা সুরে বেরিয়ে এল : এই যে চলল নিশ্চিন্তনগর, একদম খালি গাড়ি—

—চুপ করুন মশাই। খালি গাড়ি ! কানের কাছে ও-কথা আর একবার হাঁকড়াবেন তো মাড়ি উড়িয়ে দেব।

ছুঁচোর মতো মুখ মুহূর্তে ছোট হয়ে গেল আরশোলার মতো।—কী করব দাদা, পেটের দায়ে—বোঝেন তো—

—এ ইন্দুরবাবু, টিক আছে ?

—ঠিক আছে পাইজী। গাড়ী ছেড়ে দাও। কই দাদা, আপনার পয়সাটা—

ভোঁপ ভোঁপ। ঘর্মাক্ত দেহে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ইন্দুরবাবু চলে এসেছেন দরজাটার কাছে। হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বললেন, চলল মশাই নিশ্চিন্তনগর, খালি গাড়ি—

—খালি গাড়ি ! মাড়ি ওড়ানো প্যাসেঞ্জারটি ঘুসি বাগাবার আগেই ইন্দুরবাবু লাফিয়ে পড়েছেন নীচে : আচ্ছা আসুন দাদা—নমস্কার।

ষ্টার্টারে চাপ পড়েছে গাড়ির, পুরানো বাসের জীর্ণ দেহ ঝর ঝর করে নড়ছে। তার পরেই দু'পা ব্যাক করে একটা বাঁক নিয়ে সোজা এসে পড়ল পি-ডবলু-ডির কালো পীচের রাস্তায়। ইন্দুরবাবুর কথা মিথ্যে নয়—বাইরে থেকে এক ঝলক সকালের মিষ্টি হাওয়া এসে যেন যাত্রীদের সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

—আঃ, বাঁচলাম মশাই। এখন গিয়ে পৌঁছুব ভরসা হচ্ছে।

—দাঁড়ান দাদা, আর একটু দাঁড়ান। এই লক্কড় গাড়ীতে যা লোক তুলোছ, মরা নদীর ব্রীজের ওপরে উলটে না গেলে বাঁচি।

কিন্তু ও আশংকা যাত্রীদের সত্যিই নেই। আজ বিশ বছর ধরে এই পথ দিয়ে এমনি নিয়মিতভাবে বাস চলেছে, ও রকম দুর্ঘটনা কখনো ঘটেনি। ওটা শুধু কথার কথা—হালকা একটা পরিহাস মাত্র। পি-ডবলু-ডির পথ দিয়ে বাস এগিয়ে চলবে তার অভ্যস্ত নিয়মে, কালভার্ট, মাইল পোষ্ট, ধানের ক্ষেত আর টেলিগ্রাফ তারের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী পার হয়ে যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছুবে। চাপাচাপিতে সামান্য কষ্ট ছাড়া এই পথটুকু যাত্রীদের নেহাৎ মন্দ লাগে না। ট্রেন থেকে বাইরের জগৎকে যেমন একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের অত্যন্ত দূরবাসী বলে মনে হয়, বাসের বেলায়, অন্তত এই বাসের বেলায় তা বোধ হয় না। সব চেনা, সব জানা, সব প্রত্যেক দিনের পরিচিত। এই ইস্কুল বাড়িটা—তারপরে : চোখ বুজে মুখস্থ বলার মতো যে কোনো প্যাসেঞ্জার আবৃত্তি করে যেতে পারে : তারপরে দুটো ধানের আড়ত ছাড়ালে আসবে হাটখোলা—তাঁতিদের একটা বস্তি। পথের পাশেই বড় বড় বাঁশের খুঁটিতে নানা রঙের সুতো টানা দেওয়া। তারপর ক্রমশ বাঁধের মতো

উঁচু হয়ে উঠতে উঠতে গাড়িটা চড়বে মরা নদীর ব্রীজে। একদিন খরস্রোতা ছিল—আজকে কঙ্কাল। দু'তিনটে ছোট ছোট ধারা বিকীর্ণ বালুশয্যার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে—নীল শ্যাওলায় ঢাকা। মাঝখানে চরের ওপরে ঘন কাশের বন। তারপর টানা পীচের পথ। আম জাম শালের ছায়া, ধানের ক্ষেত, বিল, সাঁওতাল রাজবংশীর গ্রাম—ছোট ছোট দু'খানা হাট। পাশের কাঁচা রাস্তায় কখনো গোরুর কখনো বা একটা মোষের গাড়ি। কালো জামের ডালা মাথায় কালো সাঁওতাল মেয়ে, ধানের বস্তার বাঁক কাঁধে ম্যালেরিয়া পীড়িত বাংলার চাষা। পুরোনো বটগাছের নীচে সিঁদুর লেপা কালীর থান। তারপরেই চৌধুরী সাহেবের ল্যাংড়া আমের বড় বাগানটা—সেটা ছাড়ালেই লাশ কাটা ঘর, ছোট ছোট একতলা বাড়ীর পত্তনি। মহকুমা সহর নিশ্চিন্ত নগর।

পীচের রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে এবার মফঃস্বল সহরের পাথুরে পথ। উঁচু উঁচু খোয়াতে নড়বড়ে বাসে ঝরাং ঝরাং করে ঝাঁকুনি। এঞ্জিনের সামনে জল ঢালবার মুখটা দিয়ে ভস্ ভস করে গরম ধোঁয়া উঠছে—যেন ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলছে গাড়িটা। তারপরে উকিল সারদা চক্রবর্তীর দেওয়াল দেওয়া লিচু বাগানের পাশ দিয়ে বাঁক নিলেই সহরের বাজার। বাস্ ষ্ট্যাণ্ড,—আউট এজেন্সির অফিস, চা আর খাবারের দোকান। যাত্রা শেষ।

ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ—

মফঃস্বল সহরের নির্জীব কুলির দল হাই তুলে একে একে এগিয়ে আসে বাসের দিকে। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। পথের শেষ, ধীরে সুস্থে নামালেই হবে।

—কুলি লাগবে বাবু, কুলি ?

—কোন্ পাড়ায় যাবেন হুজুর ? টমটম চাই ?

—এক্কা হোগা হুজুর, এক্কা ?

বাসের মধ্যে মুখরতা : ওরে ভোঁদা, জুতোটা কোথায় ফেললি হতভাগা ? তুমি একটু ঘিয়ের বোয়ামটা ধরে নাও না গো—মেয়েটাকে কাঁখে নিয়ে কতদুর সামলাই আমি ? হুড়োহুড়ি কোরোনা বাপু, ধীরে সুস্থে নামো। এই কুলি—ছাতের ওপরে বড় চামড়ার স্যুটকেস্টা—। ছাতাটাকে অমন বেয়নেটের মতো ধরবেন না মশাই, একটু হলেই আমার চোখের দফা সেরে দিয়েছিলেন আর কি! হাঁড়িটা একটু দেখবেন দাদা—কালীঘাটের প্রসাদ আছে ওতে—

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব নীরব। এবার সত্যিই খালি গাড়ি। সকালের রোদে শূন্য বাসটা নিঝুম হয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

মহকুমা সহরের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগসূত্র রাখে এই পথ। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই। বাইরের মানুষ, বাইরের চিন্তাধারা। অভিজাত, অফিসার, ব্যবসায়ী, এমন কি তানসেনগুলির এজেণ্ট। সভ্যতার সযত্ন-চিহ্নাঙ্কিত পি-ডবলু-ডির কালো পীচের পথ। তোমার জন্যে, আমার জন্যে, আরও দশজন ভদ্র সন্তানের জন্যে। কিন্তু এ ছাড়া আর একটা পথ আছে। সেটা বাইরের নয়—একান্তভাবে অবহেলিত। তুমি, আমি আরো দশজন ভদ্রসন্তান যারা সহরে থাকে সে পথ তাদের চেনা নয়!.........

....সহরমাত্রেরই সহরতলী থাকে, ছোট মহকুমা নিশ্চিন্তনগরের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। খোয়া ওঠা রাস্তাও এ পর্যন্ত আসতে

সঙ্কোচ বোধ করেছে। দুপাশে খোড়ো ঘরগুলো অসহায় দারিদ্র্যে ভেঙে নামবার উপক্রম। যারা বাসিন্দা, তাদের কেউ কুলি খাটে, কেউ বা টমটম চালায়, কারো বা গোরুর গাড়ি আছে।

সহরের এই প্রত্যন্ত দিয়ে যে পথটা চলে গেছে, তার দিকে একবার তাকাও। পি-ডবলু-ডির পীচের রাস্তার এখানে কল্পনাও করতে পারবে না। অসংখ্য গোরুর গাড়ির ছন্দোহীন চলায় মাটি একেবারে শতধা-দীর্ণ হয়ে গেছে—কোথাও গর্ত, কোথাও জল। মোটর কিংবা বাস এ পথে আসবার দুঃসাহস করলে কর্ণের রথচক্রের মতো মেদিনী তাকে গ্রাস করবে।

এই পথ চলে যায়নি রেলষ্টেশনের দিকে। চলে যায়নি সেদিকে—যেখানে দ্রুতগামী মেল ট্রেন থেকে ডাকের ব্যাগ নামে, নামে নিখিল বিশ্বের অসংখ্য বার্তা। যেখান থেকে কলকাতা মাত্র আটঘণ্টার মেয়াদ—এ পথ তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে—যেন জোর করেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে মহা পৃথিবীর স্পর্শ থেকে।

এখান দিয়ে ভারমন্থর গোরু মোষের গাড়ি চলে। ধূলোভরা পা নিয়ে দেহাতী মানুষ বহুদূর থেকে হেঁটে আসে,—ধান বিক্রী করতে, মোকদ্দমা করতে, রেজেষ্ট্রী আফিসে, সহরের বাজারে। চিরনিদ্রাতুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চিরন্তন রাস্তা—প্রকৃতির করুণাতেই একান্তভাবে সমর্পিত।

দুধারে মাঠ চলেছে আদি-অন্তহীন বিস্তারে। পাশে পাশে গ্রাম—অযত্নবর্ধিত ঝাঁকড়া আমের গাছ। শ্যাঁওড়া—বাবলা, বাঁশ; ঝুরি নামানো বটের বিস্তীর্ণ ছায়ার নীচে পোড়া মাটির ভাঙা উনুন, গোরুর

গাড়ির গাড়োয়ানেরা ফ্যানসা ভাত আর পেঁয়াজের তরকারী রান্না করে খেয়েছে। মজাদীঘির উঁচু পাড়ি—তার ওপরে তালগাছ দাঁড়িয়ে দিগন্তের প্রহরায়; মাথায় শকুন বসে আছে—সাপের মতো গলা উঁচু করে দূরবীণের মতো শাণানো চোখ দিয়ে লক্ষ্য করছে কোথাও পড়ে আছে কিনা মরা গোরু।

ধূ-ধূ মাঠ—লোকে বলে, 'ভাতারমারীর মাঠ'। মরা কয়েকটা বাবলাগাছ ছাড়া একটি ছায়াতরু নেই কোনখানে। গল্প আছে, এক চাষা দুপুরের রোদে মাঠে কাজ করতে করতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। বৈশাখের রৌদ্রে পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, অথচ একবিন্দু জল নেই কোথাও। দূরগ্রাম থেকে তার স্ত্রী ভাত নিয়ে আসে, সেদিন কী কারণে আসতে বেচারার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর যখন প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, এমন সময় দূরে দেখা গেল স্ত্রী ভাত নিয়ে আসছে। আকুল হয়ে চাষা হাতের পাঁচনবাড়ি দেখিয়ে তাকে সংকেত করতে লাগল—তাড়াতাড়ি আয়।

কিন্তু স্ত্রী বুঝলে সম্পূর্ণ উল্টো। সে ভাবলে তার আসতে দেরী হয়েছে দেখে স্বামী তাকে শাসাচ্ছে, কাছে এলে তার পিঠে ভাঙবে পাঁচনবাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে দৌড় দিলে। স্বামী যত কাছে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে, সে তত প্রাণপণে ছোটে। ফলে যা হওয়ার তাই হল। খানিক পরে স্বামী সেই যে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে—আর উঠল না। স্ত্রী যখন ব্যাপারটা বুঝলে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে—সেই থেকে এই দিক্‌বিস্তীর্ণ মাঠের নামকরণ হয়েছে 'ভাতার মারীর মাঠ'।

এই মাঠের মধ্য দিয়ে নিশীথ রাত্রে যখন গাড়ি চলে, তখন গাড়োয়ানদের বুক একটা অজানা আশঙ্কায় টলমল করে। তরল অন্ধকারে তারা যেন বহুদিন আগেকার একটা বিস্মৃত বিয়োগান্তক নাটকের অভিনয় দেখতে পায় এখানে। যেন গোঁ গোঁ করে কে আর্তনাদ করছে যন্ত্রণাবিকৃত গলায়ঃ একটু পানি দে বউ, একটু পানি। মরে গেলাম, বুক জ্বলে গেল, একটু পানি—

তাড়াতাড়ি গোরুর পিঠে শাঁটা বসায় তারা। প্রয়োজনের চাইতে বেশি গলায় জোর দিয়ে বলে, চল্-চল্! আঃ, শালার বলদ হাঁটে না ক্যানে হে!

এই মাঠখানা পেরোলেই মনসা কাঁটা আর বুনো ঝোপ-ঝাড় হঠাৎ পথখানাকে আচ্ছন্ন করে দেবে। তারপরে আর রাস্তা নেই। এখান থেকে গাড়িটা গড় গড় করে অনেকখানি নীচে নেমে গিয়ে সোজা পড়বে বালির ওপরে। প্রায় আধ মাইল বালির ডাঙার ভেতর দিয়ে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে আর বহু কষ্টে চাকা টেনে টেনে গাড়ি নিয়ে যেখানে পৌঁছুবে—সেখানে ক্ষীণ অথচ খরস্রোতা উত্তর বাংলার পরিচিত পাহাড়ী নদীর ওপরে খেয়াঘাট। লোকে বলে, রঙীর ঘাট।

রঙীর ঘাট। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সম্পত্তি—ইজারা নিয়েছে পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বিন্ধ্যেশ্বরী সুকুল। একটা চোখ কাণা, তাই লোকে তাকে কাণাঠাকুর বলে ডাকে। মসৃণ করে কামানো মাথা, তার ওপর টিকিটি কেটে নেওয়া ধানগাছের গোড়ার মতো খাড়া হয়ে আছে। ঘাটের একপাশে একখানা মাচাং বেঁধে নিয়েছে সে—তার ওপরে বসে তুলসী-দাসী রামায়ণ পড়ে, চৈতনটির সযত্ন পরিচর্যা করে আর গাড়ির পারানি আদায় করে।

দুখানা খেয়া নৌকো বিন্ধ্যেশ্বরী সুকুলের। ঠিক দুখানা নয়—দুখানা দুখানা চারখানা। দুটো করে বড় নৌকা একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার ওপরে বাঁশের 'ফরাস' পেতে গোরুর গাড়ি পারাপারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এক একবারে সাত-আটখানা করে গাড়ি পার হয়। মহিষ আর বলদ সাঁতরে পার হয় নদী। তবে সব সময় সাঁতরাবার দরকার হয় না, গরমের দিনে হেঁটেই পাড়ি জমানো চলে।

তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে বটে, কিন্তু এদিকে নজরটি ঠিক আছে কাণা-ঠাকুরের।

—তিনখানা গাড়ি তোমাদের। আঠারো আনা।

—আর আঠারো আনা ?—গাড়োয়ানেরা বোকার মতো হাসে, তুষ্ট করবার চেষ্টা করে : এই একটা টাকাই ধরে দিনু ঠাকুর মশাই, লিয়ে লাও।

—উঁহু, হবে না। সরকারী রেট বাঁধা আছে।

—লে বাপ, ক্যানে ঝ্যামেলা করেক খামেখা ? গোটা টাকাটা ধরি দিনু, দুগণ্ডা পয়সার লেগ্যে এমন করেন না বাবে।

—নেহি, নেহি, আঠারো আনা।—জোর দিয়ে কাণা ঠাকুর বলে : আঠ্‌ঠেরো আনা। পৈসা নিকালো।

—দে না বা, দু গণ্ডা পাইসা বিড়ি খাবা দিলে তুমার কি হেবে ?

—হোবেনা।—রামায়ণ পড়তে পড়তে চোখের পাতা ভিজলেও এ ক্ষেত্রে কাণা-ঠাকুরের মন ভেজে না। শেষ পর্যন্ত আর এক আনা পয়সা দিলে তবে রফা হয়।

তবু ঘাটোয়াল কাণাঠাকুর লোক খারাপ নয়। বাস কোম্পানি বা

রেল-কোম্পানির মতো নিছক অর্থকরী সম্পর্কটাই সত্য নয় এখানে। খাতিরের লোককে বিনা পয়সাতেও পার করে দেয় কাণা-ঠাকুর, একসঙ্গে বসে এক কল্‌কেতে গাঁজাও খায়। কুশল আদান-প্রদানও চলে মাঝে মাঝে।

—তোমার মুলুকের খবর কি ঘাটোয়াল ?

—আর খবর ! কাণাঠাকুরের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে হয়তো : খত পাইলাম, হামার তিনটা' ভৈঁসা মরিয়ে গিছে। মনটা বড় খারাপ হইয়ে আছে ভাই।

—তিনটা ভৈঁসা মরি গেইছে ! আহা—হা চুক্-চুক্ !—শ্রোতারি কণ্ঠে সমবেদনার সুর : বড় খারাপ খবর ঘাটোয়াল ভাই।

—হাঁ, বড়া খারাপ খবর, কাণা ঠাকুরের চোখ ছল-ছলিয়ে ওঠে : কিন্তু কী করা যাবে ভাই, সব নসীব। ভগবান রামচন্দ্রজীর যো হিচ্ছা হোয়—

—সে তো বটেই. সে তো বটেই। ল্যাও ভাই—একটা বিড়ি ল্যাও। ভাল কথা, আমাকে একটু মহাবীরজীর পরসাদ দিয়ো ভাই। বিটিটার ব্যামার কিছুতেই ছাড়োছে না।

রঙীর ঘাট পার হয়ে সার বেঁধে গাড়িগুলো এগিয়ে চলে গ্রামের দিকে। গ্রাম—ধানের মাঠের মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন শ্রীহীন বাংলার গ্রাম। কখনো কখনো এক একটা ছোট গঞ্জ, এক একটা নগণ্য হাটখোলা। ভাঙা মন্দির, ভাঙা মসজিদ। বটের শিঁকড়ে শিঁকড়ে সহস্র পাকে জড়ানো দীর্ণ বিদীর্ণ পীরের দরগা, পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ।

এমন একদিন ছিল, যখন বাংলার সভ্যতা নগর-প্রাণ মাত্রই ছিল

না। দেশের অন্ত্যপ্রত্যন্তে সে নিজেকে বিস্তীর্ণ করেছিল, বিকীর্ণ করেছিল। বরেন্দ্রভূমির মাটির প্রত্যেকটি ধূলিকণায় অতীতের কঙ্কাল তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু সে রাম নেই—সে অযোধ্যাও নেই। যে যুগে রেলগাড়ী ছিল না এবং যন্ত্রচক্রের দ্রুত গতিতে কলকাতা—দিল্লী বোম্বাই—ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের পৃথিবী রয়টারের মারফৎ মানুষের কাছে এসে পৌছোয়নি, সে যুগে মানুষ নিজের দেশকে চিনত, নিজের দেশের মানুষকেও জানত। কেন্দ্রীভূত সমৃদ্ধি নয়—সর্বময় পরিব্যাপ্তি। কিন্তু যদুপতির মথুরাপুরী নেই, রঘুপতির উত্তর কোশলও নিশ্চিহ্ন! সেদিনের মহাস্থান আজ ধ্বংসাবশেষ, সে যুগের কোটিবর্ষ আজ আত্মবিস্মৃত। বহির্মুখী নগর আজ একচক্ষু হরিণের মতো তাকিয়ে আছে কোন্ শূন্য দিগন্তের দিকে? অথচ তার চতুর্দিকে প্রসারিত যে বাংলাদেশ—লজ্জায় দুঃখে দুর্ভিক্ষে যা কালের প্রহর গুণে চলেছে, সেখানে অলক্ষ্যে কোন্ যে মৃত্যুবাণ শাণিত হচ্ছে সে খবর আজও তার কাছে এসে পৌছোয়নি!

কিন্তু গোরুর গাড়ী চলেছে, চলেছে পায়ে হেঁটে মানুষের দল। গ্রাম থেকে সহরে, সহর থেকে গ্রামে। আসছে ধান-চাল-পাট। মন্থরগামী গোরুর গাড়ির বহু ক্লেশে বয়ে আনা প্রাণ-সঞ্চয়ের স্রোতে একদিন যদি ভাঁটা পড়ে, তা হলে হাহাকার উঠবে সহরে। হাহাকার উঠবে মোটর বাসের যাত্রীদের মধ্যে।

বিভিন্নমুখী দু খানা গোরুর গাড়ি। একখানা সহর থেকে আসছে শূন্য হয়ে, আর একখানা বোঝাই নিয়ে যাচ্ছে সহরে

—কত করি ধানের ভাও দেখি আলেন সহরৎ?

—দেখি তো আনু পাঁচ টাকা করি।

—পাঁচ টাকা! অ্যাতে দর ক্যানে চড়ছে কহিবা পারেন?

—ক্যামন করি কহিব বারে। মহাজন যে দর দিবা চাহিবে, ওই দরই তো নিবা নাগিবে। ভালোই তো হৈল্—দর বাড়িলেই—

—না বারে, মোর মনে ভালো ঠ্যাকোছেনা।

গাড়িদুটোর ব্যবধান বেড়েই চলেছে ক্রমশ। পরস্পরের কাছে পরস্পরের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। চাকায় চাকায় লাল ধুলোর ঝড় ওঠে। তালগাছের মাথা থেকে শোনা যায় শকুনের পাখার ঝাপট। উজ্জ্বল রৌদ্রে মাঠের ওপর জ্যোতির্ময় পতঙ্গের মতো রাশি রাশি শিমুলের তুলো ওড়ে। চটাস্ চটাস্ করে ল্যাজের ঘা দিয়ে গোরুগুলো পিঠের ওপর থেকে ডাঁস তাড়ায়।

—হাঁট হাঁট, মহামাই। বড় পিয়াস নাগিছেরে, ঝট করি ঘরত্ চল্ বা—গোরুকে সাদর আর অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ, সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজে একটি প্রচণ্ড মোচড়। ল্যাজ তুলে ছুটতে সুরু করেছে গোরু। আর বেশি দেরী নেই, এই মাঠখানা ছাড়ালেই বাঁ হাতে কাঁচা রাস্তায় এগিয়ে তার গ্রাম। তার বিশ্রাম, তার সংসার, তার প্রেম, তার দুঃখ।

পিছনে টানা-রাস্তা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে মহকুমা সহর নিশ্চিন্ত নগর পর্যন্ত। অনাদৃত পথ, ভুলে যাওয়া পথ। সহরের খিড়কি দুয়োর পর্যন্ত সীমানা। নিভৃত অথচ অনিবার্য পঞ্চ গৌড়ের প্রাণ-প্রবাহিকা।

—দুই—

আর এই দুটি পথের কেন্দ্রস্থলে হচ্ছে মহকুমা সহর নিশ্চিন্ত-নগর। অনগ্রসর জেলার অনগ্রসর মহকুমা। যতটুকু অনুমান করা যায়, ঠিক ততটুকুই—তার বেশি কিছুই নয়। কয়েকখানা কোঠাবাড়ি, কিছু টিনের ঘর, বাকী খড়ের এবং খোলার। খোয়া-ওঠা সরু সরু রাস্তা। আধ-ভাঙ্গা ড্রেনে পচা জল জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সহরের আনাচে-কানাচে জঙ্গল, আবর্জনা ছড়ানো একফালি পোড়ো মাঠ। মিউনিসি-প্যালিটির অচল টিউব-ওয়েল, কোনো এক ভূতপূর্ব সব-ডিভিশনাল অফিসারের নামাঙ্কিত রিং-ভাঙ্গা ইঁদারা। পুরোনো থিয়েটার হলের জরাজীর্ণ টিনের চালায় নতুন টকী হাউস,—যেখানে সগৌরবে প্রদর্শিত হচ্ছে হাতী পিকচার্সের রোমাঞ্চকর ছবি 'চাবুকওয়ালী'। বাজার, মুদীখানা, কাপড়ের গদী, মনোহারী ষ্টোর্স—বেনেতি মশলার দোকান; খাপরার ঘরে তেপায়া টেবিল আর হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার সাজিয়ে চায়ের ষ্টল—বাইরে বিবর্ণ সাইনবোর্ড: দি গ্র্যাণ্ড নিশ্চিন্ত-নগর র‍্যাস্তরাঁ।

ঠিক এইখান দিয়ে সহরটা দুভাগ হয়ে গেছে। সহরের প্রান্তচারিণী নদীটি থেকে ছোট একটি শাখা এসে যেন ঠিক মাঝখান দিয়ে টেনে দিয়েছে ব্যবধানের সীমারেখা। মশকগুঞ্জিত খানিকটা বিচ্ছিন্ন জল আর জঙ্গলের ওপর দিয়ে লোহার পুল। মোটর চলতে পারে—বাস চলতে পারে এই পুলের ওপর দিয়ে—মহকুমা সহরের একটা গৌরব বিশেষ।

পুল পেরিয়ে গেলে সহরের অভিজাত-অঞ্চল।

বাংলো প্যাটার্ণের কয়েকখানা মনোরম বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান।

ছেলেদের হাই স্কুল, মেয়েদের এম-ই ইস্কুল। ত্রিলোকেশ্বর শিব আর মহামায়ার পুরোনো মন্দির। পোষ্টাপিস, সাব-রেজিষ্ট্রি, মুন্সেফ আর সাব-ডিভিসন্যাল অফিসারের আদালত, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একটা শাখা। উকিল আর অফিসারের ক্লাব—আড়াইশো বইয়ের পাবলিক লাইব্রেরী। তার ওপারে নদী, স্নানের ঘাট—একরাশ নৌকো, জেলেদের গ্রাম, শ্মশান-ঘাট। মহকুমা সহর নিশ্চিন্ত-নগরের সীমানা।

তর্কটা জমে উঠেছিল পাবলিক লাইব্রেরীর বারান্দায়।

আসরে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। কালির দাগ আর চায়ের কাপের বাদামী রেখায় চিহ্নিত ওভ্যাল-শেপের পুরোনো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চার পাশে খানকয়েক চেয়ার। সকালের বাসে খবরের কাগজ এসে পৌছেছে, তারই খান তিনেককে কেন্দ্র করে রসনা-সংগ্রামের সূত্রপাত।

উকিল পূর্ণবাবু টেবিলে কিল মেরে বললেন, ওসব জানি না মশাই। সোজা যেটুকু বক্তব্য তা সেবাগ্রাম থেকে অনেক আগেই বলে দেওয়া হয়েছে।

ইস্কুল মাষ্টার রমাপদবাবু বললেন, অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, কুইট ইণ্ডিয়া। পলাশীর পর থেকে অনেককাল তো ইজারা ভোগ করলে বাপু, আর কেন? প্রভু, এবারে দয়া করে চাঁটিবাটি তোলো।

রমাপদবাবুর মুখে ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ হাসি: চাঁটিবাটি তুলবে বলে মনে করেন আপনি?

—নিশ্চয়, কেন তুলবে না?—পূর্ণবাবুর কণ্ঠ জ্বালাময়ী: না তোলে, তোলাতে হবে।

—ওঃ, তোলাতে হবে।—রমাপদবাবু স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মিটল একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা।

পূর্ণবাবু চটে গেলেন।

—একথার মানে কি মশাই? আপনি কি বলতে চান যে স্বরাষ্ট্র শাসনের অধিকার আমাদের আজো হয়নি? জানেন, সেদিন লুই ফিসার কী বলেছেন?

—লুই ফিসার আমেরিকার মানুষ, কাজেই তাঁর গায়ে লাগবার কথা নয়। যার ল্যাজে পা পড়ে, সেই টের পায়! জন-বুলের আসল কথাটা যদি জানতে চান, তাহলে তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট-পুঙ্গব এইচ-জি-ওয়েলস্ স্যার হরিশঙ্কর গৌরকে যে চিঠিটা লিখেছেন দয়া করে সেটা পড়ে দেখবেন।

—আরে রাখুন মশাই—ওসব ছেড়ে দিন। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না আজকাল। অ্যামেরি থেকে সুরু করে সব শেয়ালই তো এক রা ধরেছে। যা করবার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে যে—

কথাটা কেড়ে নিয়ে রমাপদবাবু বললেন, প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সাবালক? ক্রীপ্‌সের চুষি-কাঠিতে আর ভুলছি না? তাহলে প্রমাণটা দয়া করে করুন।

—করবই তো।—উত্তেজিত পূর্ণবাবু চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। সামনের বাঁধানো দাঁত দুটো এমনভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠল যেন তারা ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

—করবই তো। দাঁড়ান না মশাই, ওয়াকিং কমিটির মিটিংটা একবার শেষ হোক। যে রেজোলিউসন আমরা নেব—

সার্কেল অফিসার বিনোদ বাবু এক কোণায় বসে চুরুট টানছিলেন। একটু নিদ্রাতুর মানুষ, পাঁচ মিনিটের জন্যেও কোথাও গা এলাতে পারলে সেই ফাঁকে ঝিমিয়ে নেন। আজো চিরাচরিত অভ্যস্ত নিয়মে বিনোদ বাবুর চোখ দুটি বুজে আসছিল আস্তে আস্তে। মুখটা একটুখানি ফাঁক হয়ে সবে নাসারন্ধ্রে গম্ভীর গুরুধ্বনি নিঃসৃত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই চুরুটের ইঞ্চিখানিক পোড়া ছাই ছ্যাঁক করে বুকের ওপর পড়ল। হাত-পা ছুঁড়ে ধড়-ফড় করে খাড়া হয়ে বসলেন বিনোদ বাবু।

—অঁা—প্রকাণ্ড মুখগহ্বর থেকে একটা অলৌকিক শব্দ বেরুল : কী বলছিলেন পূর্ণবাবু!

হঠাৎ যেন পূর্ণবাবুর নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হল। যেন বিপরীত পক্ষের উকিলের মুহুরির কাছে মামলার কয়েকটা উইক-পয়েণ্ট ফাঁস করে ফেলেছেন তিনি।

—না স্যার, বলছিলাম এই কুইট ইণ্ডিয়ার কথা।

—অঃ!—গলা থেকে আর একটা নাদধ্বনি নির্গত হল। শোনা যায় সেকালে নাকি সার্ভেয়ার হয়ে বিনোদবাবু চাকরীতে ঢুকেছিলেন, তারপর মাতুলকুলের সহায়তায় কোনো একটা তৈলাক্ত মসৃণ পথ দিয়ে বুড়ো-বয়সে সাব-ডেপুটির এই পদমর্যাদা তিনি লাভ করেছেন। কিন্তু জনশ্রুতি যাই থাক, বিনোদবাবুর লেখাপড়ার দৌড়টা যে খুব বেশীদূর নয়, প্রতি-মুহূর্তেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। তাঁর জাজমেণ্টের পাঠোদ্ধার করতে কেরাণীর দল এবং তিনখানা ডিক্সনারী হিমসিম খায়।

খবরের কাগজের পাতায় হাঁপানির একটা বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে বিনোদবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত আলোচনাটাই তাই তাঁর কাছে নিতান্ত হাস্যকর এবং একান্তভাবে ছেলেমানুষি বলে অনুমিত হল।

—কিছুতেই কিছু হবে না মশাই—বিনোদবাবু চুরুটে টান দিলেন : যাই বলুন তাই বলুন, চার্চিলের ইম্পিরিয়াল শিল্ডই শেষ পর্যন্ত আমাদের রক্ষা করবে।

মুহূর্তে পূর্ণবাবুর মুখভাব পরিবর্তিত। কিন্তু সুযোগটা নিলেন মোক্তার কালীসদন বাবু। অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো হাসলেন তিনি।

—স্যার, যা বলেছেন। এই হচ্ছে লাখ কথার এক কথা। হাতে ধরে যা দেবে তাই ভরসা, হাজার লাফালাফি করলেও কোনো সুবিধে হবে না।

পূর্ণবাবুর মুখে-চোখে বিদ্রোহ ঘনাতে লাগল। ইচ্ছে হল প্রকাণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেন কালীসদনের গালে। কোর্টে মামলা ঝুলছে বলেই কি এমন করে তোষামোদ করতে হবে না কি। বিবেক বলেও তো একটা জিনিষ আছে মানুষের।

উৎসাহিত হয়ে বিনোদবাবু বললেন, দেখলেন তো কতবার। বোমা পিস্তল ছোঁড়া হল—যেন পট্কা-বাজীতেই অত-বড় জাতটা ঘাবড়ে যাবে। আর গান্ধীর চীৎকার তো কতকাল থেকেই চলছে। কী লাভ হল বলতে পারেন?

কালীসদন বাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে গেলেন, কিছুই না।

পূর্ণবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, কিন্তু স্যার—

একটা উদার স্নেহময় হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন বিনোদ বাবু। কালো মাড়ির ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া তীক্ষ্ণাগ্র দাঁতগুলো উদ্ঘাটিত হল বিকটভাবে। বিনোদ বাবু হাসলে তাঁর আলজিভটা পর্যন্ত দেখা যায়।

—হা-হা হা। এখনো ছেলেমানুষ আছেন পূর্ণবাবু। আরো একটু বয়স বাড়ুক, তখন বুঝতে পারবেন সব।

কালীসদন বললে, সে তো বটেই। আপনারা হ্যার বহুদর্শী প্রবীণ লোক, আপনাদের মতো অভিজ্ঞতা আমরা পাবো কোথায়?

রমাপদ বাবু ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন অখণ্ড মনোযোগে। এতক্ষণে মৃদুমন্দ ভাবে হাসলেন তিনি। পূর্ণবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, যাক আর ভাবনা নেই কী বলেন? এ ড্যানিয়েল্ হ্যাজ কাম টু জাজমেণ্ট।

ইস্কুল-মাষ্টার রমাপদ বাবু সাধারণত ইংরেজি ক্লাসিক সাহিত্য থেকেই প্রয়োজন মতো টীকা-টিপ্পনীগুলো সংগ্রহ করে থাকেন। তাঁর ধারণা এবং আরো দশজন তাঁর স্বজাতীয়ের মতোই ধারণা: ওতে বুদ্ধিমান শ্রোতা বাণাহত হয় এবং নির্বোধেরা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সার্কেল অফিসার বোধ হয় এ দুটির মাঝামাঝি, অতএব কর্ণক্ষেপ করলেন না। তাঁর নাক এবং মুখের সম্মিলিত চেষ্টায় পরিতৃপ্তির উদ্গারের মতো একটা গদ্গদ ধ্বনি বেরুল।

—তিরিশ সালে আমিও বাড়ির সব বিলিতী কাপড় পুড়িয়ে শেষ করেছিলাম মশায়। গিন্নী দিন-রাত্তির কাণের কাছে ঘটর ঘটর করে চরকা ঘোরাতে সুরু করলেন। চাকরী-বাকরী ছেড়ে আমিও লেংটি ধরে ছোট গান্ধী হওয়ার জো হয়েছিলাম—হা-হা-হা—

কালীসদন বাবু ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কলিকের ব্যথাটা চিন্ চিন্ করে ওঠায় তেমন যুৎসই ভাবে হাসতে পারলেন না। সুতরাং পূর্ণ বাবু এই সুযোগে তাঁকে ডিঙ্গিয়ে গেলেন। রমাপদ বাবুও হাসলেন এবং সেই সঙ্গে চিরন্তন একটা দার্শনিক তথ্য তাঁকে আলোড়িত করতে লাগল: মূর্খে হাসে ক'বার।

কাপড়ের কষিটা হাসির ধমকে শিথিল হয়ে এসেছিল—নতুন উত্তেজনায় সেটাকে আবার শক্ত করে বাঁধলেন বিনোদ বাবু: শেষে

দেখলাম—বাবা, কিছুতেই কিছু হয় না। কত ছাব্বিশে জানুয়ারী এল গেল, অনেক ফ্লাগ উড়ল, কিন্তু স্বাধীনতা এল না। তা ছাড়া পাকিস্তান, পরিস্তান আর গুলিস্তানের যে নমুনা দেখছি, তার চাইতে ইংরেজিস্তান ঢের ঢের ভালো।

—ইংরেজিস্তান! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—

পেট চেপে ধরে কালীসদন বাবু শেষ চেষ্টা করলেন: পাকিস্তান—গুলিস্তান—ইংরেজিস্তান! কী অসাধারণ হাসির কথা। এর পরে না হেসে আত্মসংযম করবার চেষ্টাটা আত্মহত্যার তুল্য মূল্য। উঠুক কলিক্—জ্বলে যাক বুক আর পেট—সারা রাত ভিজে গামছা আর জলের ঘটি পেটের উপরে বসিয়ে আর্তনাদ করতে হোক—কিন্তু এ অবস্থায় নীরবতাটা কল্পনাতীত ঘটনা। মৃদু-মন্দ নয়, অট্ট-অট্ট নয়—অট্টতর থেকে অট্টতম কোনো ব্যাপার সংসারে নেই কি? মামলাটার দুর্বল জায়গা-গুলোর একটা সুরাহা হয়ে যাবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

রমাপদবাবু আবৃত্তি করলেন: Laugh, laugh, thou idiot—

কিন্তু আকস্মিক ভাবে একটা কেন্দ্র-বিন্দুর দিকে চোখ পড়তেই আলোচনাটায় ছেদ পড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সামনে দিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠেছে লোহার পুলের ওপর। আর সেই পুলের রেলিং ধরে নীচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটি চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। একটি তরুণী,—দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা এবং রূপবতী। নীচের খালে নতুন বর্ষার জলে সাঁওতাল মেয়েরা পোলো ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে, মেয়েটির লক্ষ্য বোধ হয় সেই দিকেই।

প্রথমে দেখেছিলেন পূর্ণ বাবু, তার পর একে একে সকলেই অনুসরণ করলেন তাঁর দৃষ্টিকে। আর এক সঙ্গে সকলের মনে হল এতক্ষণ যেন

সময়টা বৃথাই অপচয় হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি অদৃষ্টপূর্বা, সুতরাং বিস্ময় এবং রোমাঞ্চ যুগপৎ শিহরণ জাগিয়ে দিলে। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বিনোদ বাবু আরো শক্ত করে কাপড়ের কষি বাঁধলেন।

সত্যিই তো সময় এতক্ষণ বৃথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল না তো কী! সকালের আকাশে এক প্রান্তে শ্রাবণ-মেঘের নীলাঞ্জনমায়া। বৃষ্টি এখন নামবে না, কিন্তু একটা স্নিগ্ধ মধুর ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পৃথিবী। লাল কাঁকরের পথের দুপাশে শাল গাছে কচি পাতা ধরেছে, সিঁদুরের মতো টুকটুকে রাঙা তার রঙ। আর দুটো বড় বড় গাছে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে কদমফুল—রাশি রাশি, গণনাতীত। শালের রাঙা পাতায় দোলা দিয়ে আর বৃষ্টির গুঁড়োর মতো কদমফুলের রেণু উড়িয়ে দিয়ে পূবালি বাতাস বয়ে যাচ্ছে। লোহার পুলের তলা দিয়ে কলোচ্ছ্বাসে ধাবমান নতুন জল—তার মৃদুসঙ্গীত এতক্ষণ পরে যেন এখানে ভেসে এল। পূর্ণ বাবু অনুভব করলেন বাতাসে ভিজে ঘাস আর কদমফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ যেন এইমাত্র দিকে দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল।

খস্-স্—খবরের কাগজটা উড়ে পড়ল নীচে। কিন্তু কালীসদন বাবুও সেটাকে তুলে আনতে ভুলে গেলেন।

কী আশ্চর্য পটভূমিতে—কী আশ্চর্য একটি মেয়ে। পূর্ণবাবু কিছুদিন পশ্চিমে বাস করেছিলেন, চকিতে তাঁর চেতনার মধ্যে কাজরী-গানের একটা কলি যেন গুঞ্জন করে গেল। রমাপদবাবু ভাবলেন 'শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে' কোনো 'জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না' কি স্বপ্নের পাখা মেলে নেমে এল মহকুমা সহর নিশ্চিন্ত-নগরের এই নগণ্য কুৎসিত একটা লোহার পুলের ওপরে! বহু বছরের পরিচিত এই পুরানো পথ, এই শালের শ্রেণী. ওই কদমফুল—ওদের যে এমন একটা আলাদা রূপ

কখনো অপরূপ হয়ে মনে নেশা ধরিয়ে দিতে পারে, এ কথা আগে কি কল্পনাও করতে পেরেছিল কেউ ?

কিন্তু রমাপদ বাবু যাই ভাবুন, মেয়েটি কিন্তু জনপদবধূ নয়—সম্পূর্ণ-ভাবেই তার উল্টো। সুডোল গ্রীবা এবং সবুজ শাড়ীর ওপর দিয়ে আধুনিকার বেণী বিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটি অনাবৃত দীর্ঘ বাহু পাশে ঝুলে পড়েছে—শুভ্র মণিবন্ধে ঝিকমিক করছে কঙ্কণ, কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট একটি সোনালি ঘড়ি। হাতে আলগাভাবে ধরা কালো-চামড়ার ছোট একটি ব্যাগ। শুভ্র-পায়ে সাদা রঙের জুতোটা যেন দেহ-বর্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে মিলে গিয়েছে। নিশ্চিন্ত-নগরের নিশ্চিন্ততাকে বিঘ্নিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। পূর্ণবাবু বাতাসে কদমফুলের গন্ধটা নিশ্বাসে নিশ্বাসে টানতে লাগলেন—যেন এই গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির কোনো একটা যোগাযোগ আছে।

সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু ঘটে গেল মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যে। চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া গিলে ফেলে বিনোদবাবু যেন খাবি খেলেন বারকতক। তারপর বললেন, বাঃ, বেড়ে মেয়েটি তো। কে ও ?

কালিদাসের ভাষায় রমাপদ বাবুর মন আর্তনাদ করে উঠল : দিঙনাগের স্থূল হস্তাবলেপে কবিতার উজ্জ্বল সৌন্দর্য যেন কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ! অমন হাঁড়ির মতো গলায় এমন অসভ্যের মতো প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা না করলেই কি চলত না বিনোদবাবুর ? আর পূর্ণবাবুর মনে হল চুরুটের দুর্গন্ধে কদমফুলের মিষ্টি সুরভিটা হঠাৎ যেন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অতটা আত্মবিস্মৃত হবার সুযোগ ছিল না ঘাগী মোক্তার কালীসদনবাবুর। পেটের কলিকের ব্যথাটা মুহুর্মুহু তাঁকে বাস্তব

পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনছিল। পেটটা চেপে ধরে কালীসদন পকেট থেকে এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বার করে গলায় ঢেলে দিলেন, তারপর বিকৃত মুখে বললেন, ওই নতুন—

তিনটি গলায় সমস্বরে ঐকতান ধ্বনিত হল: ওই নতুন কী?

হোমিওপ্যাথিক বড়িগুলো গিলতে গিলতে কালীসদন বললেন, লেডী ডাক্তার।

—লেডী ডাক্তার!—তিনটি কণ্ঠে আবার সমবেত প্রতিধ্বনি। কদমফুল নয়, কড়া চুরুট নয়, ক্লাবের পাশে একটা ছোট খানার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির যে সমস্ত সঞ্চিত আবর্জনা বর্ষার জলে অভিষিঞ্চিত হচ্ছিল, তাদের একটা পচা গন্ধ পেলেন পূর্ণবাবু। আর রমাপদবাবুর মনে হল শুধু দিঙনাগ নয়, তার সঙ্গে কুল্লুক ভট্ট ও (অবশ্য কুল্লুক ভট্ট কে এবং কী, তা তিনি জানেন না, কিন্তু নাম শুনেই তাকে কাব্য-রস-বঞ্চিত উল্লুক বলে কল্পনা করা চলে) এসে যোগ দিয়েছেন। লেডী ডাক্তারদের অখ্যাতির কথা তো বিশ্রবিশ্রুত—আরো বিশেষ করে তারা যদি তরুণী এবং তন্বঙ্গী হয়। স্কুল মিস্ট্রেসদের ক্ষমা করা যায়, তাদের সঙ্গে ললিত-কলার কিছুটা সম্পর্ক আছে এবং সুকুমারী কিশোরী ও তরুণীদের নিয়েই তাদের কারবার। কিন্তু লেডী ডাক্তার! মেয়ে হয়েও যারা নির্বিচারে বাড়ী বাড়ী নাড়ী টিপে বেড়ায় এবং দরকার হলে ছুরি-কাঁচি ধরে কচাকচ শব্দে অপারেশন করতে পারে, তাদের নিয়ে প্রাণে এতটুকু চঞ্চলতা অনুভব করাও বোকামি। নির্বিকার মুখে যারা মানুষের গায়ে ছুরি বসাতে পারে, নির্মমভাবে তারা মানুষের মনেও ছোরা বসাবে এতো স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু মেয়েটি যে আশ্চর্য সুন্দরী। লেডী ডাক্তারের কল্পনাতেই যে কালো মোটা একটি বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে ওঠে অথবা

আত্মসিবদনা কৃকলাসিকা মনের ভেতর ছায়া ফেলে যায়, তার সঙ্গে এর তো এতটুকুও মিল নেই কোনখানে। অন্তত রমাপদবাবু বিশ্বাস করতে পারলেন না।

—সত্যি জানেন আপনি, লেডী ডাক্তার?

—আমি জানি না?—কালীসদন বাবু করুণার ভঙ্গিতে হেসে উঠেই কলিকের ব্যথায় করুণ হয়ে গেলেন: আমার পাশের বাড়িতেই যে ওর কোয়ার্টার। কাল সকালে আমদানি হয়েছে এখানে।

রমাপদবাবু চুপ করে গেলেন, কিন্তু প্রশ্ন করলেন পূর্ণবাবু।

—নামটাম শুনেছেন?

—হুঁ। এডিথ রেখা সান্ন্যাল।

—এডিথ!—তিনটি কণ্ঠের কাতর কোরাস।

—হুঁ! যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে কালীসদন বললেন, ক্রীশ্চান।

শেষ ঘা এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ঘা। ব্যঞ্জনাময় একটা স্তব্ধতায় কয়েক মুহূর্ত সকলে নীরব। এরপর আর বলবার কিছুই নেই—স্বপ্ন দেখবারও আশা নেই এতটুকু। শুধু আড়ালে কুৎসা রটাবার এবং সাগ্রহে কুৎসা বিশ্বাস করবার পথটাই খোলা রইল মাত্র।

মেয়েটি এইবারে এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে—বিজয়িনীর মতো সুঠাম পদক্ষেপে হেঁটে আসছে লোহার পুলটা পার হয়ে। রঙীন শাড়ীর আঁচল বাতাসে পরীর পাখার মতোই উড়ছে—আশ্চর্য সুন্দর দেহটিকে যেন গানের তালে তালে দোলা দিয়ে এগিয়ে আসছে সে। আর ওপরে মেঘ-মেদুর আকাশ, লোহার পুলের নীচে জলের কলধ্বনি, বাতাসে কদমফুলের রেণু উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় কাঁপছে শালের পাতা, কিন্তু—

কিন্তু আলেয়া!

বিনোদবাবু শব্দ করে বড় একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর যেন মস্তবড় একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন এমনি গলায় বললেন, ওঃ, কিরিশ্চান? সাহেবের রক্ত নিশ্চয় আছে, তাই অমন ফুট-ফুটে চেহারা। .

—নিশ্চয়।—কালীসদন প্রতিধ্বনি করে বললেন, ওদের তো আর জাতের ঠিক ঠিকানা নেই কিছু। ছশো ছত্রিশ জাত মিলেই তো ওরা।

ইস্কুল-মাষ্টার রমাপদ বাবু ম্লান হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু এইবারে তর্ক তুললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল এরা সকলে মিলে যেন অসহায়া একটি তরুণীকে অপমান করবার চেষ্টা করছে এবং সে অসম্মান থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব একমাত্র তিনিই নিতে পারেন, তাঁর নেওয়া উচিত।

—সে কথা আপনারা বলতে পারেন না। ছশো ছত্রিশ জাত না হলে যে কেউ ক্রীশ্চান হয় না—এ আপনাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। নাম শুনলেন না? এডিথ রেখা সান্যাল, খাঁটি ব্রাহ্মণের মেয়ে হওয়াও আশ্চর্য নয়।

—তাতে কি আসে যায় মশাই? ক্রীশ্চান—ক্রীশ্চান।—বিনোদবাবু রায় দিলেন: আহম্মদ আলী ভট্টাচার্য নাম শুনেছেন কখনো? আমি শুনেছি। তাই বলে তাকে একেবারে পুরুতঠাকুর ভেবে মাথায় তুলতে হবে নাকি? জাত দিলেই রক্তের জাত গেল।

—তাই নাকি?—রমাপদ বাবুর মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি দেখা দিল: তা হলে অন্তত আর যাই হোক, আর্যামির গর্বটা বাঙালীর পোষায়না। পর্তুগীজ, মোঙ্গল, নিগ্রো, দ্রাবিড়—আরো কত জাতির রক্ত বাঙালীর ভেতরে মিশেছে তার খবর রাখেন?

কিন্তু রমাপদ বাবুর তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ভাষণটা শেষ পর্যন্ত কারো কানে

ঢোকেনি এবং নিজের অজ্ঞাতেই রমাপদ বাবুও চুপ করে গেছেন। সামনে দিয়ে এডিথ রেখা সান্যাল হেঁটে চলেছে। আশ্চর্য সুন্দর রঙ—অপূর্ব দেহের গঠন। সত্যিই বিজাতীয় রক্ত কিছুটা তার মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। চলার মধ্যে একবিন্দু সংকোচ নেই, চোখের দৃষ্টিতে বাঙালী-সুলভ লজ্জার রেশমাত্র দেখতে পাওয়া গেলনা। পায়ের জুতোটার শব্দ স্বচ্ছন্দ দ্রুত লয়ে—যেন সামরিক ভঙ্গিতে মেয়েটি মার্চ করে চলেছে। একবার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি এদের দিকে নিক্ষেপ করেই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে, রাস্তাটার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিনোদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাই বলো, তাই বলো, মেয়েটি দেখতে কিন্তু বেড়ে। সে সম্বন্ধে কারো মতভেদ ছিল না, কিন্তু কথাটার জবাব দিলেন না কেউ। মেয়েটি দেখতে যে কী সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে গেলে যেন অনুভূতিটাকে খর্ব করেই ফেলা হবে।

কোথায় গেছে রাজনীতি—কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে শৃঙ্খলিতা ভারতমাতা! সব কিছুকে ছাপিয়ে আগ্নেয়-রূপিণী এডিথ রেখা সান্যাল মনের সামনে ভেসে উঠছে। বাতাসে খবরের কাগজটা বারান্দা থেকে উড়ে গিয়ে নীচের আবর্জনাস্তূপের ওপরে পড়ল।

ক্রীং—ক্রীং। সাইকেলটাকে নীচে আছড়ে ফেলে মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো পোষ্টাপিসের কেরাণী সুধীর এসে সামনে দাঁড়ালো। যেন ঘুম ভেঙে হঠাৎ চারটি প্রাণী জেগে উঠল—ভেসে উঠল স্বপ্ন-সাগরের কোনো একটা অতল-স্পর্শতা থেকে।

—কী খবর সুধীর, কী খবর? অমন ঝোড়ো-কাকের মতো চেহারা নিয়ে এমন ভাবে ছুটে এলে কোত্থেকে?

—মস্ত খবর রমাপদবাবু! শোনেননি?—সুধীর হাঁপাতে লাগল।

—না তো, কী হয়েছে ?

—ওয়ার্কিং কমিটির সেসন শেষ হওয়ার আগেই কংগ্রেসের সমস্ত লিডারকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে—রেডিয়োতে খবর এল।

—সমস্ত লীডারকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে ?

সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি—একটা আর্তনাদের মতোই শোনালো। বিনোদবাবুর ঠোঁট থেকে খসে পড়ল চুরুটটা।

দেওয়ালে বড় একখানা ক্যালেণ্ডারের ৯ই আগষ্ট তারিখটা তখন অগ্নিলেখার মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

—তিন—

রঙীর ঘাট।

শ্রাবণের ভরা নদী খরস্রোতে বয়ে চলেছে। লাল ঘন জল—তীরের মতো ধারায় ছুটেছে আর দুধারের খাড়া উঁচু পাড়ি থেকে ঝপাঝপ শব্দে খসে পড়ছে মাটির চাঙাড়। একটা বিরাট আন্দোলন, একটা আবর্ত—তার পরেই কোনো খানে আর এতটুকুও চিহ্ন নেই। বৈশাখের মরা নদী—যার তিরতিরে সংকীর্ণ জলরেখার মধ্যে হাঁটু অবধি ডুবতনা, শ্যাওলা জমে কালো হয়ে থাকত এখানে ওখানে, আর মাছের আশায় প্রতীক্ষা করত 'কানি বক'—পরিপূর্ণ শ্রাবণে তার রূপই বদলে গিয়েছে।

থেকে থেকে জলের মধ্যে শুশুকের 'উলাস'। কখনো কখনো চলস্রোতে ঘড়িয়ালের ছায়া ভেসে ওঠে—বাঁশির মতো অদ্ভুত শব্দ করে ঘড়িয়াল ডাকে—দ্রুত উলাসের পর উলাস দিয়ে শুশুক ছুটে পালায়, মাছের দলে চাঞ্চল্য জাগে। ভাঙা-পাড়ির গায়ে বসে বান মাছ ধরবার চেষ্টা করে গাঁয়ের লোক—বাঁকে বাঁকে 'ভেসাল' পাতা—খরস্রোতে তার বাঁশগুলো থর থর করে কাঁপে। আকাশে জলের গন্ধ ওঠে—বালির গন্ধ ওঠে, ভিজে কাদা আর পচা শ্যাওলার গন্ধ ওঠে—ভেসালের জাল থেকে ওঠে আধ-পচা সুতো আর মাছের আঁশের গন্ধ।

আর তার ভেতর দিয়ে কাণা-ঠাকুরের খেয়া নৌকোয় পারাপার চলে অবিশ্রান্ত। গোরু মহিষের গাড়ি আসে মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত-নগর থেকে, গোরু মহিষের গাড়ি যায় মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত-নগরে।

খেয়াঘাটের ওপারে বটগাছ-তলায় আড্ডা জমে কাণা-ঠাকুরের। নানা স্তরের লোক জড়ো হয় সেখানে। এটাকে দেহাতি লোকের ছোট খাটো একটা ক্লাব বললেও ভুল হয় না।

গাঁজার কলকে ঘোরে বৃত্তাকারে, হাতে হাতে ঘোরে হুঁকো। নীল ধোঁয়া, লাল ধোঁয়া। কড়া নেশা, ঠাণ্ডা নেশা। গাঁজা টেনে কেউ বুঁদ হয়ে যায়, তামাকে টান দিয়ে কারুর বা মুখ খোলে। হাত পা নেড়ে সজোর সোল্লাস এবং সভয় আলোচনা চলে।

গল্প জমায় আধিয়ারেরা, ছোট চাষারা, গাড়ির গাড়োয়ানেরা। খেয়াপারের জন্যে প্রতীক্ষমান ছোটখাটো জোতদারেরা গাড়ির ভেতর বসেই নিজের স্বাতন্ত্র্য তথা আভিজাত্য বজায় রাখে, কিন্তু আলোচনায় যোগ না দিয়ে থাকতে পারে না। মাথামাথি করতে চায়না শুধু আড়তদার আর মহাজনেরা—একমাত্র তারাই শুধু ভিন্ন জগতের জীব। গাড়ির মধ্যে পড়ে পড়ে তারা ঝিমোয়, কখনো বা নিদ্রাজড়িত চোখে জিজ্ঞাসা করে ধানের দর, মটর আর কলাইয়ের ভাও।

পুরানো প্রসঙ্গেরই জের টানে কাণা-ঠাকুর। পুরানো কিন্তু চিরন্তন।

—দেশের হালচাল ভারী খারাপ।

—হাঁ—ভারী খারাপ। অন্তত এই একটি ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই কোনোখানে, সমস্বরে সম্মিলিত প্রতিধ্বনি ওঠে।

একজন এরই মধ্যে প্রশ্ন করে বসে, লড়াইয়ের কী হল ভাই?

—লড়াই আর থামবেনা।

—থামবেনা! এমনি করেই চলবে বরাবর?

—হাঁ, চলবে বরাবর।

—তাতে লাভ কী? খালি মানুষ মেরে কার কী লাভ হয়?

গোরুর গাড়ির ছইয়ে হেলান দিয়ে স্বল্পশিক্ষিত জোতদার করুণার হাসি হাসে। ফতুয়ার পকেট থেকে একপয়সা দামের একটা সিগারেট

বার করে ধরায় সেটাকে। বলে, ওরে মানুষ মুফৎ লড়াই করে না, দরকার আছে বলেই করে। ধানের জমি নিয়ে তুই মাথা ভাঙা-ভাঙি করিস কেন?

—হাঁ—হাঁ, ঠিক বাত আছে।—বিচক্ষণের মতো মাথা নাড়ে কাণা ঠাকুর।—অংরেজকে হঠিয়ে জার্মাণ রাজা হৈতে চায়। ওহি লিয়ে তো লড়াই।

—জার্মাণ কি এবার জিতে যাবে চৌধুরী সাহেব?

গাড়ির মধ্যে জোতদার শিউরে ওঠে।

—খবর্দার, খবর্দার। ওসব কথা মুখেও আনবিনে বেকুফ কোথাকার। থানার দারোগা সাহেব একবার শুনলে জিঞ্জীর পরিয়ে সিধা সদরে চালান করে দেবে। কে জিতবে না জিতবে তা দিয়ে তোর দরকার কি বাপু? হেলে চাষা আছিস—ভুঁইতে লাঙল ঠেলেই খোসা হয়ে থাক। আদার ব্যাপারী তুই, জাহাজের খবর নিতে গিয়ে শেষতক মারা যাবি রে।

—হাঁ—হাঁ—এ বাত ঠিক আছে। লড়াই হয় হোবে, তুমহার আমার কি আছে দাদা? সরকারী ঢোল শুনোনি? জাস্তি বাত শুননেসে ফাটক হোতে বি পারে লোকের।—কাণা-ঠাকুর সমর্থন এবং বিশদ করে দেয় জোতদার চৌধুরী সাহেবের বক্তব্যটাকে।

মানুষগুলি চুপ করে থাকে। সত্যি কথা—হাটে হাটে সরকারী ঢোল তারা শুনেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে একটু কোনো রকম অসঙ্গত আলোচনা করলেই ভারত রক্ষা আইনের বজ্র-মুষ্টি এসে চেপে ধরবে—এক বিন্দুও ক্ষমা করবেনা। অতএব সাধু সাবধান, নীরবতাই হচ্ছে স্বর্ণতুল্য। বেশি বুঝতে চেয়োনো, শুধু ধৈর্য ধরো এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা

করো। আর শাস্ত্রের শাশ্বত বাণীকে প্রতিনিয়ত স্মৃতিপথে সজাগ করে রেখো : বোবার শত্রু নেই।

শুধু সরকারী ঢোলই নয় হাটে হাটে। কিছু দিন আগে ঋণ-সালিশীর স্পেশ্যাল অফিসার এসেছিলেন নবীপুরের থানায়। আশে পাশে দশখানা গাঁয়ে সাড়ম্বরে হাঁক দিয়ে গেল ইউনিয়নের চৌকিদারেরা। সকলে এসো, দলে দলে এসো। সরকারী অফিসার তোমাদের যুদ্ধের তাৎপর্য বিশদ ব্যাখা করে জানিয়ে দেবেন—বুঝিয়ে দেবেন এই যুদ্ধের সার্থকতা এবং সেই সঙ্গে তোমাদের কর্তব্য। নবীপুর ডাক-বাংলোর সামনে জমায়েত।

আহ্বান উপেক্ষা করে কার সাধ্য? রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, এমন কি ছ'ক্রোশ ঘাঁটা ঠেঙ্গিয়ে কচি-কাঁচায়, তরুণে-প্রবীণে, পুরুষে-নারীতে পাঁচ সাতশো লোক এসে জমা হল। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষগুলো ডাক-বাংলোর সামনে মাঠের মধ্যে বসে বেলা বারোটা থেকে প্রতীক্ষা করতে লাগল। গনগনে রোদে চাঁদি পুড়ে যাচ্ছে, কোনখানে এমন একটু ছায়া নেই যে বিশ্রাম নিতে পারে তারা। কিন্তু স্পেশ্যাল অফিসার জানেন—এসব অভ্যাস এদের আছে। সারাদিন রোদে জলে জমি চাষ করে; সারারাত এরা বিনিদ্র চোখে গাড়ি হাঁকায়—একটু ঝিম এলেই আরোহী ধমক দেয় : হাঁকিয়ে চল্ ব্যাটা, নইলে সকালবেলা নিশ্চিন্ত-নগরে গিয়ে মেলগাড়ির বাস ধরতে পারবনা। এক-আধ বেলা অনাহারে কাটানোও এদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস।

অতএব নিশ্চিন্ত স্পেশ্যাল-অফিসার সারা দুপুর পরম পরিতুষ্টি সহকারে দিবানিদ্রা দিলেন। ঋণসালিশীর চেয়ারম্যান লোক ভালো, খ্যাটের ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ করেনি, আর এই দারুণ গরমে টানাপাখার

বাতাসটাও মন্দ লাগছিলনা একেবারে। চারটে পর্যন্ত ঘুমিয়ে স্পেশ্যাল-অফিসার নবীপুরের দারোগা এবং বন্দরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চা খেলেন, খেয়ে গল্প করলেন। বাইরে তখন লোকগুলো ক্ষিদেয় ধুঁকছে, গাল-কপাল দিয়ে টস্-টস্ করে কালো ঘাম ঝরে পড়ছে তাদের। অথচ পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কড়া-পাহারা দিচ্ছে চৌকিদারেরা।

—এই সুম্মুন্দি, উঠছ কেন? সরকারী হুকুম—কেউ যেতে পাবেনা।

সূর্যের চাইতে উত্তপ্ত বালি দুঃসহ। চৌকিদারেরা এতকাল চোর ধরবার অসম্ভব আশায় রাত-বিরেতে শুধু গৃহস্থ-পাড়ায় হাঁক দিয়েই ফিরেছে, কিন্তু এতগুলো মানুষকে দাবিয়ে রেখে এমন করে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ কখনো পায়নি। বিবর্ণ নীল-উর্দি পরে তারা ভারত-সম্রাটের সঙ্গে অতি নিকট যোগসূত্রটার অলক্ষ্য শিহরণ অনুভব করেছে। তাদের পিতলের চাপরাশ সূর্যের আলোয় মহিমা-মণ্ডিত হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে।

মানুষগুলোর কিন্তু দাঁত কড়মড় করে। একবার কায়দায় পেলে হয় তোমাকে। এক চড়ে উড়িয়ে দেব চাপরাশ, একটানে ছিঁড়ে দেব দাড়ির গোছা।

প্রাণান্তিক প্রতীক্ষার পরে ডাক-বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পড়তে লাগল। একটা ছোট টেবিল এল—তার ওপরে দুটো ফুলদানি—ঋণ-সালিশীর চেয়ারম্যান পাঠিয়ে দিয়েছেন। একে একে নবীপুরের মহাজনেরা, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার, পোষ্টমাষ্টার এবং দু-চার জন ভদ্রলোক এসে চেয়ারে আশ্রয় নিতে লাগলেন। তার পরে খানিকটা রহস্যময়

স্তব্ধতা। দামী স্যুটে এবং সোনার চশমায় হুজুরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। তার পর বক্তৃতা। কত যুক্তি—কত আবেগ, কত উচ্ছ্বাস। তার মাথা-মুণ্ডু কেউ কি বুঝতে পারল? নাৎসী দস্যু, রাক্ষস জাপান—তোমাদের বুকের রক্ত খেতে এসেছে। সব হুঁসিয়ার। কেউ টাঁ ফোঁ কোরো না, বেঘোরে মারা যাবে। আর সব চেয়ে বড় কথা—যুদ্ধে যোগ দাও, চাঁদা দাও এবং বাড়ী ফিরে গিয়ে জগদীশ্বর ও আল্লার কাছে প্রার্থনা করো যেন আমরা শত্রু-নিপাত করতে পারি।

অত্যন্ত ভালো ভালো কথা—শুনলে শুধু ইহকাল নয়, পরকালের কাজ হয়ে যেতে পারে বলে সন্দেহ হয়। শুধু চাঁদার কথাটাই একটু অবান্তর ঠেকল। তা ছাড়া গরীবের ছেলে—দিন আনে দিন খায়, পল্টনী সিপাই সাজবার মতো বিলাসিতাটাও তাদের খুব ভালো লাগলোনা।

ঝাড়া এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে গলদঘর্ম স্পেশ্যাল-অফিসার সশব্দে বসে পড়লেন—চেয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। দুদিক থেকে দুজনে সজোরে পাখা করতে লাগল। ভেতরে খবর গেল—চা, জলদি চা।

ডাক-বাংলোর মাঠে মায়েতের ভিড় ভাঙছে। যা শুনেছে জলের লেখার মতো মুছে গিয়েছে মন থেকে। ওদের ডাকবার অর্থ কী এবং এত সব কথা ওরা কেন শুনল—এ সব প্রশ্ন ওরা কখনো জিজ্ঞাসা করেনা। ওরা এটাকে একটা স্বাভাবিক নিয়ম বলেই ধরে নিয়েছে। চৌকিদার হাঁক দিলে জমা হতে হয়—রোদে-জলে পুড়ে দুর্বোধ্য বক্তৃতা শুনতে হয়—তার পর দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসতে হয়। যা শুনেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলে যাওয়াটাই ওদের রেওয়াজ।

শুধু একটা জিনিস ভোলবার উপায় নেই—সে হচ্ছে সরকারী নিষেধ। হুশিয়ার। মুখ খুললেই বিপদ। নির্বোধই নির্বিঘ্ন।

স্পেশ্যাল-অফিসার ততক্ষণে সুগন্ধি রুমাল দিয়ে কপাল মুছছেন। তারপর সমবেত ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন বললাম ?

সকলে সমস্বরে বললেন, চমৎকার।

একটু দ্বিধা করে স্পেশ্যাল-অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় আপনাদের ?

—নিশ্চয়। একেবারে জল। —পোষ্ট-মাষ্টার আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, তিনি কথাটার ওপরে আরো বেশী জোর দিয়ে বললেন, ক্রিষ্ট্যাল ক্লিয়ার!

কাণা-ঠাকুরের আড্ডায় বসে এদের মনের সামনে ভেসে উঠছিল স্পেশ্যাল-অফিসারের নিষেধ বাণীগুলোই। সাবধান। শুধু দেখে শুনে যাও, কথা বোলনা। কথা বলার দায় অনেক।

জহর গাড়োয়ান বলদকে জাবনা দিচ্ছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, কিন্তু চৌধুরী সাহেব, যুদ্ধ না থামলে আমরা যে মরে গেলাম।

চৌধুরী সাহেব মুখের ওপরে সিগারেটের ধূমজাল বিস্তীর্ণ করে বললেন, যুদ্ধে তো কত লোক মরছে, না হয় তোরাও মরলি।

—কিছু পাওয়া যায় না, হু হু করে দর চড়ে যাচ্ছে, ধান উড়ে যাচ্ছে—

চৌধুরী সাহেব বললেন, যুদ্ধে বোমা পড়ে সহর উড়ছে—গোটা জেলাই উড়ে যাচ্ছে আর এখানে ধান উড়বে তাতে আশ্চর্য হাচ্ছস কেন আহাম্মক।

—যারা যুদ্ধ করছে, ঘর উড়ছে তাদের। আমরা তো যুদ্ধ করছি না, তবু আমাদের ধান উড়বে কেন ?

চৌধুরী সাহেব এবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। নাঃ, মরবার পাখা উঠেছে এদের, শিখেছে মুখে মুখে তর্ক করতে। উষ্মাভরে একটা ধমক

দিয়ে বললেন, চুপ কর বেল্লিক কোথাকার। আমাদের সরকার যুদ্ধ করছে—কাজেই আমরাও যুদ্ধ করছি। সোজা কথাটা বুঝিস্ না কেন?

কাণা-ঠাকুর গাঁজার কলকেতে আর একটা টান দিয়ে বললে, হাঁ, এ বাতভি ঠিক আছে। রাজা লড়াই করলে তো পরজার ভি লড়াই হইল।

—তা তো হইল।—কিন্তু গ্রামের লোকে সান্ত্বনা পায় না, আশ্বাসও পায় না। আকাল ঘনিয়ে আসছে চার দিকে। ধানের দর বাড়াতে বড় চাষী, আড়তদার আর মহাজনের কিছু সুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু দিনমজুর আর বর্গাদারেরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অমাবস্যার অন্ধকার। কিছু পাওয়া যায় না—ডাল নয়, নুন নয়, কেরাসিন নয়। সরকারী ডাক্তারখানায় ওষুধ নেই—লাল আর নীল জল। অসুখ বিসুখও যেন সময় পেয়েছে—এখানে ওখানে মানুষ মরে যাচ্ছে টপাটপ্। ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে লোকের—কী যে হবে শেষ পর্যন্ত সে কথা কারো কল্পনা করবার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু সরকারের কড়া হুকুম: কোনো কথা বলতে পারবেনা তারা, কোনো ভাবনা ভাবতে পারবেনা। মুস্কিল এই: তাদের কথা তারা ছাড়বে ভাববে কে? যুদ্ধ হচ্ছে হোক, শত্রু নিহত হয়ে যাক—প্রজারা আনন্দিত হবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আকালের শত্রু—আধিব্যাধির শত্রুকে নিপাত করে দেবে তাদের এমন বান্ধব কে আছে? যুদ্ধের আক্রমণটা তাদের ওপর নেমে আসছে প্রাত্যহিক জীবনে—যেন প্রাকৃতিক নিয়মে। তাকে নিঃশব্দে, নির্বিকার মুখে স্বীকার করে যেতে হবে: যেমন কোরে ওরা স্বীকার করে মহামারীকে, বন্যার জলকে, কাল-বৈশাখীর ঝড়কে এবং সোনার ফসলের সর্বনাশ করে দেওয়া আকাশ-ভাঙা শিলাবৃষ্টিকে।

প্রসঙ্গটা বদলে গেল হঠাৎ।

—রশি মারো, রশি মারো—ফরাস বরাব্বর। এ রামলেহড়—কাণা-ঠাকুর চীৎকার করে উঠল।

একখানা জোড়া নৌকো খান-আষ্টেক খালি গাড়ি নিয়ে এপারের ঘাটের ফরাসে ভিড়বার চেষ্টা করছে। গাড়িগুলো একটা আর একটার কাঁধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন গোরুর ঘাড় থেকে মুক্তি পেয়ে আকাশে মাথা তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ দেখলে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় ওগুলোকে। বড় বড় চাকাগুলো ধুলো আর কাদায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে—অনভিজ্ঞ কোনো আমেরিকান্ সৈন্য ওগুলোকে দেখলে কল্পনা করতে পারে অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট্ বলে। জোয়াল-খোলা বলদ-গুলো জাবর কাটছে অনাসক্তের মতো—নৌকো থেকে নেমে যে আবার ওই গাড়িগুলোকে কাঁধে তুলতে হবে, সে কথা যেন ভুলেই গেছে তারা। জলের ভেতর দিয়ে সাঁতরে আসছে তিন চারটে মহিষ—কখনো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ডুব দিচ্ছে, কখনো নাক দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে খানিকটা জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। পরণের কাপড়টাকে মাথায় পাগড়ির মতো বেঁধে নিয়ে বছর বারোর একটি ছেলে লেংটি পরে একটা মহিষের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং হাতের পাঁচনবাড়ি ঘুরিয়ে দলটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

ওদিকে রামলেহড় লগি মারছে প্রাণপণে। সামাল্-সামাল্—রশি-রশি—নৌকো ফরাসের কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিক ভিড়তে পারছে না। মাঝনদীতে বড় বড় ঘূর্ণি ঘুরছে বটে, কিন্তু জলটা সেখানে শান্ত। কিন্তু পারের কাছে নদীর স্রোত যেমন উদ্দাম, তেমনি প্রখর। কুটোটা ফেললে শাঁ করে দেখতে দেখতে উড়ে যায়। নৌকোর তলায়

হু-হু করে জল-গর্জন বেজে উঠছে—ফরাসে ভিড়বার আগেই তাকে ঠেলে নিয়ে চলে যেতে চায়। রামলেহড় আর বনোয়ারী মালা দুদিক থেকে লগি ঠেসে ধরেছে, কিন্তু নৌকা বাগ মানে না, যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। হাতের পেশীগুলো তাদের শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে. গা দিয়ে টস্‌টস্‌ করে ঘাম ঝরছে। কাণা-ঠাকুর আবার বললে, সামা-ল্—

এপারে যারা বসেছিল, তারা ছুটে এল সবাই। নৌকো থেকে দুটো মোটা কাছি ছুঁড়ে দিয়ে শক্ত করে ফরাসের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে এরা। ঝর-ঝর—ঘটাস্‌। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বড় নৌকো ফরাসের গায়ে আটকে গেল।

গড়-গড় করে গাড়িগুলো টেনে নামানো হতে লাগল। ঢালু পাড়ির ওপর দিয়ে ঠেলে এবার ওপরে ওঠানো : হেঁইয়ো সাবাস। যারা আড্ডা দিচ্ছিল, তামাক আর গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়েছিল—তারাও এসে এবার যোগ দিয়েছে। দুঃখের পটভূমিতে যারা প্রতিদিন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত—তাদের মধ্যে অন্তত এ ক্ষেত্রে একটা অসংশয় একতা আছে। ধরো, চলতে চলতে বুক-সমান এঁটেল কাদায় আটকে গেল কারো বোঝাই গাড়ি : বলদ পা তুলতে পারছে না, গাড়োয়ানের পাঁটা খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে—মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে শাদা ফেনা। পেছন থেকে অন্য গাড়ি যারা এল—হাজার কাজ, হাজার অসুবিধে থাকলেও এ গাড়িকে তুলে না দিয়ে তারা এক পাও নড়বে না। হাজার বৈষম্য এবং বিভেদের মধ্যেও এখানে ওদের স্বাভাবিক সংঘবুদ্ধি—প্রাকৃতিক সাম্যবাদ।

এবার কাণা-ঠাকুরের ওঠবার পালা।

—পৈসা—ঘাটোয়ালকা পৈসা—

আবার প্রাত্যহিকের পুনরাবৃত্তি।

—দুটা পাইসা ছাড়ি দে বা—বিড়ি খাবা দিবু না?

—তুমাদের পৈসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঘাট আমার লোক্‌সান হইয়ে যাবে নাকি?

—ঘাট নোক্‌সান হবে। হেঁ—হেঁ—হঁ—মানুষগুলো আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করে কাণা-ঠাকুরকে: তুমি তো টাকার কুমীর ঠাকুর মশাই, তোমারও লোকসানের ভাবনা?

—ওসব হোবে না—পুরো পৈসা না দিলে গাড়ি যাইতে দিবো না।

এপারে যারা প্রতীক্ষা করছিল, তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জোতদার চৌধুরী সাহেবের রাজনীতির আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে—ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি: ওরে জাফর—গাড়ি তোল্ শিগ্‌গির—

একে একে বলদ খুলে সকলে গাড়ি নামিয়ে আনছে ফরাসের ওপর। রামলেহড় আর বনোয়ারী নৌকোয় গাড়ি তুলতে সাহায্য করছে গাড়োয়ানদের।

—হাঁ—হাঁ—পানিত গিরাইয়োনা জী—

—শালার ভৈঁসা ক্যামন করে বা—জলত নামোতে ডরোছে ক্যানে?

—ধরেক ভাই, পিছাটা মোর ধরেক। মারো জোয়ান—হেঁইয়ো—

চৌধুরী সাহেব গাড়ি থেকে নেমে নৌকোর গলুইয়ে এসে বসলেন। বদনা ডুবিয়ে নদী থেকে জল তুলে অঞ্জলি করে ধুয়ে নিলেন মুখ, চোখ আর দাড়ি। তারপর আরাম করে এক পয়সা দামের সিগারেট ধরালেন একটা। মাথার মধ্যে চিন্তার চরকীপাক—মস্ত একটা

দেওয়ানী মামলা ঘাড়ের ওপর ঘুরছে, সে সম্বন্ধে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

জহর গাড়োয়ান বললে, শালার বলদও লড়াই করিবা চাহে নাকি হে? ঘাড় সিধা কইরছেনা ক্যানে জী—জার্মাণ ফৌজ হইল্ নাকি বলদ?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল—এমন কি জোতদার চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত। আর সেই সময়ে মাথার ওপর দিয়ে ধ্বনিত হয়ে গেল লৌহ-যন্ত্রের গর্জন। ঘর্-র্-র্। একটা কর্কশ কুৎসিত শব্দ। নদীর জল চমকে উঠল—চমকে পাখার ঝাপট দিলে তালগাছের মাথায় ধ্যানস্থ শকুন। বরেন্দ্রভূমির শূন্য প্রান্তর আর ক্ষেতের ধানের শীষ পর্যন্ত যেন বিমানের পাখার শব্দে কাঁপতে লাগল।

মানুষগুলোর হাসি যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে সকলে তাকালো আকাশের দিকে—বিস্মিত আর বিহ্বল দৃষ্টিতে। যেন তাদের একবার ভালো করে দেখে নেবার জন্যেই বিমানটা ছোঁ মেরে নীচে নেমে এল অনেকখানি। গোরুগুলো সভয়ে দাপাদাপি করে উঠল—নৌকাটা ডোবে আর কী। পরক্ষণেই ঘর্‌র্—গো-গো-গোঁ—! তালগাছের মাথা থেকে ভয়ার্ত শকুনদের উড়িয়ে দিয়ে বিমান অদৃশ্য হয়েছে নিঃসীম নীল-দিগন্তে, চলেছে হয়তো কোনো সুদূর সীমান্ত থেকে যুদ্ধের বার্তা বহন করে।

জাফর গাড়োয়ান মুখটাকে আড়াই ইঞ্চি ফাঁক করে বললে, সাবাস কারখানা হে! ঝড়ের মতো উড়ি গেল—

চৌধুরী সাহেব বললেন, হুঁ, লড়াই ফতে করতে যাচ্ছে।

লড়াই তো ফতে হবে—কিন্তুঃ জহর কিছুতেই পুরানো কথাটা

ভুলতে পারছে না। সক্ষোভে বললে, কিন্তু আমাদের কী সুরাহা হবে জোতদার সাহেব ?

বিরক্ত জোতদার সাহেব কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথাটা তাঁর মুখ থেকে আর বেরুলো না। ওপার থেকে যে সব যাত্রী নেমেছিল, তাদের মধ্যে একজন হাত-পা ছুঁড়ে কী যেন বলে যাচ্ছে উত্তেজিত ভাষায়। তার চার পাশ ঘিরে ভিড় জমিয়েছে চাষারা আর গাড়োয়ানেরা—যেন তাদের মধ্যেও কিছু একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে।

—কী হৈল্, ওইঠে কী হৈল্ বা-রে ?

—খুব চিল্লাইছে লালচাঁদ মণ্ডল। কী হৈল্ হে লালচাঁদ ?

লালচাঁদ এবার এগিয়ে এল এদিকে। মাথায় তামাটে রঙের অল্প চুল—মুখে কিশোরের মতো অপরিণত গোঁফের রেখা—রাজবংশীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। ময়লা ফতুয়ার অন্তরালে বলিষ্ঠ পেশল বুক। হাতের মাংসপেশী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোটা নীল শিরা উঠেছে। গলায় হল্‌দে রঙের পৈতা গোল করে জড়ানো, একটা মণিবন্ধে লোহার বালা, আধি-ব্যাধির প্রশমন কামনায় বালাটা হাতে পরা হয়েছে। সাধারণ রাজবংশীর চেহারা—তবু অসাধারণ তার বিরল ভ্রূর নীচে জ্বলন্ত পিঙ্গল চোখ দুটো। যারা লালচাঁদকে চেনে তারা জানে অন্ধকারে ওই চোখ দুটো জ্বলে—যেন জানোয়ারের চোখ।

লালচাঁদ রাজবংশী ভাষায় তীব্রস্বরে যা বললে তার বঙ্গানুবাদ এই : তোমরা কি কিছুই শোনোনি এখনো ?

—না, ভাই, কী হয়েছে ?

—সহরে হুলুস্থূল। গান্ধী মহারাজকে ধরে ফাটকে পুরেছে, আর সেই সঙ্গে কংগ্রেসের আর সব নেতাকেও ধরে নিয়ে গেছে।

—তাই নাকি।

একশো গলার প্রতিধ্বনি উঠল। শুধু রাজবংশীরা নয়, জহর, জাফর, এমন কি চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কোন কথা নেই।

চৌধুরী সাহেব প্রথমে মুখ খুললেন, হুঁ লীগের কথা না শুনেই—

কিন্তু লালচাঁদ শুনতে পেলনা। উনিশ শো তিরিশের আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করেছে সে, জেল খেটে এসেছে। তার চোখ জ্বলতে লাগল: ভাই সব, একথা আমরা যেন কখনো না ভুলি যে আমাদের জন্যেই গান্ধী মহারাজ জেলে গিয়েছেন। তোমার আমার সকলের জন্যেই আজ তাঁর এই দুঃখ, এই লাঞ্ছনা। আমরা একথা কখনো ভুলবনা—কখনোই না। বন্দে মা-তরম্—

—বন্দে মা-তরম্—

অনেকটা যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই দেহাতী মানুষগুলো সমস্বরে ধ্বনি তুলল: বন্দে মা-তরম্—গান্ধীজী কী জ-য়—

শান্ত, ঘুমন্ত রণ্ডীর ঘাট। খেয়া পারাপার চলে, খোসগল্প জমে কাণা-ঠাকুরের আড্ডায়, গাঁজা আর তামাকের ধোঁয়ায় নানা স্বপ্ন দেখে গ্রামের লোক। কাণা-ঠাকুর পারানির পয়সা হিসেব করে আর তুলসীদাস পড়ে, রামলেহড় আর বনোয়ারী নৌকো ঠেলে—ফরাসের কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে: সামাল্—সামাল্—রশি। পরিচিত—প্রতিদিনের আত্ম-আবর্তনশীল জীবন। কিন্তু আজ সেখানে এল এ কি মন্ত্র—এ কি জয়ধ্বনি! প্রাত্যহিকের অভ্যস্ত কাব্যে আজ এ কোন

নতুন ছন্দ নিজেকে সূচনা করল—অসংখ্য উদ্দীপ্ত কণ্ঠে—নিরুদ্ধ বজ্রাগ্নির আকস্মিক শিখা-সম্পাতে!

আবার তাল গাছের মাথায় পাখা ঝটপট করে উঠল শকুন—বরেন্দ্র-ভূমির বিস্তারিত দিক-প্রান্তরে থর থর করে শিউরে উঠল ধানের শীষ। ফরাসের নীচে শ্রাবণের ভরা নদীর তীক্ষ্ণ জলগর্জন—আর থেকে থেকে ঝুপ্-ঝাপ্ করে মাটির চাঙর ভেঙে পড়বার শব্দ।

—চার—

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় এডিথ হস্‌পিট্যাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে এল। ক্লান্তি আর অবসাদে সমস্ত শরীর তার আচ্ছন্ন। সারাদিনের মধ্যে এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার সুযোগ সে পায়নি।

শহর ছোট—হস্‌পিট্যাল্ আরো ছোট। কিন্তু মানুষের রোগ ব্যাধি শহর কিংবা হাসপাতালের আয়তন হিসেব করে দেখা দেয় না। এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কাজের চাপে এডিথ একেবারে তলিয়ে গিয়েছে।

বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করলে। ইঁদারার কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল—দু-এক ঘটি গায়ে পড়তে না পড়তেই শীত ধরে যায়, কিন্তু এডিথের সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল এতক্ষণ—নিজের শারীরিক অস্তিত্বটাই যেন তার খেয়াল ছিল না।

কাপড়-চোপড় বদলে একটু লঘু প্রসাধন করে বারান্দার ডেক-চেয়ারে এসে সে বসল। চাকরটা এসে চা দিয়ে গেল, চায়ে চুমুক দিতে দিতে এডিথ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল অন্ধকার দিগন্তের দিকে।

এদিকে ছোট শহরের মিটমিটে কতকগুলো আলো—খোয়াওঠা রাস্তায় খট্-খট্ করে টমটম চলছে—। সিনেমা হাউসের অ্যাম্‌প্লিফায়ার থেকে বিকৃত কণ্ঠে একটা ভয়ঙ্কর গান বাজছে—যেন ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করছে কেউ। কিন্তু কান পাতলে শোনা যাবে, গানের মধ্যে বীররস একেবারেই নেই, নিতান্তই মৃদু কোমল ব্যাপার: চামেলির বুকে চাঁদের পরশ সম্পর্কে ভাব-গভীর খানিকটা বিলাপ। সেই বিলাপে মাঝে মাঝে যখন ছেদ পড়ছে তখন উড়িয়া হোটেল থেকে রামায়ণ পড়বার

একটা বিচিত্র সুর শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে উকিল সারদা বাবুর বাড়িতে রেডিয়োর সঙ্গীতালাপ—নিতান্তই মফঃস্বল শহর—ধূলো-উড়ানো মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত-নগর যেন রাতারাতি গন্ধর্বলোক হয়ে গিয়ে সুর-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে।

আর এক পাশে মাঠ—ধূ-ধূ মাঠ। অন্ধকার তার ওপর দিয়ে কালো কালির মতো গড়িয়ে চলেছে। ওখানে গান নেই—ঝিঁ ঝিঁ করে তীব্রকণ্ঠে ঝিঁঝিঁ ডাকছে—ডাকছে সোনা ব্যাং, কোলা ব্যাং, কাঠ ব্যাং। একটা ঝুপসী শ্যাওড়া গাছে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে ঝগড়া করছে প্যাঁচা। উল্কামুখীর আলো আলেয়া হয়ে দপ্-দপ্ করে উঠছে। আর বহুদূরের আল্-পথ দিয়ে কে যেন হেঁটে চলেছে—চলার তালে তালে দুলছে তার হাতের লণ্ঠন।

মাঠ—কালো কালি গড়িয়ে যাওয়া দিক্‌চক্রহীন মাঠ। তার বুকে জেগে আছে মহকুমা-শহর নিশ্চিন্তনগর। যেন বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি দ্বীপ। হঠাৎ এডিথের মনে হল: সমুদ্রে যেমন টাইফুন আসে—একটা বিশাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ে তীরতটের যা কিছু সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তেমনি করে কি কখনো ওই কালো প্রান্তর থেকে আসতে পারে একটা বিরাট প্রাণবন্যা—এই মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত-নগর—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা সকলে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ বারোই আগষ্ট। আকাশের একপ্রান্তে থম্-থম্ করছে খানিকটা কালো মেঘ—ঝড়ের ইঙ্গিত বয়ে সেই মেঘ ফুলে উঠছে, ফেঁপে উঠছে। রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

পাশের টেবিলটাতে ঠুন্ ঠুন্ করে শব্দ। এডিথ মুখ ফেরালো। ছোকরা চাকর চায়ের কাপটা নিয়ে যেতে এসেছে।

—কে, আনোয়ার? আর এক পেয়ালা চা দিস আমাকে।

—জী।

মনের মধ্যে খেলা করছে নানা এলোমেলো অলস ভাবনা। মাঠের পাড় থেকে চমৎকার বাতাস আসছে—ভারী ভালো লাগছে এডিথের। অন্ধকার আলের পথে লণ্ঠনের আলোটা দুলতে দুলতে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে আরও দূরে। আকাশের ওই কোণাতে হঠাৎ খানিকটা রক্ত ছড়িয়ে দিল কে? চাঁদ উঠছে নাকি?

কিন্তু—রক্ত! কালোর ওপরে খানিকটা টকটকে লাল রক্ত। মনে পড়ল রেজেষ্ট্রি অফিসের পেশকার হরিহর তরফদারের কালো বউটার আজকে ছেলে হয়েছে হাসপাতালে। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে কী ওষুধ-বিষুধ হরিহর তার স্ত্রীকে খাইয়েছিল কে জানে—শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি। এখনো অক্সিজেন চলছে—মেয়েটা বাঁচবে কি না বলা শক্ত। অত রোগা শরীর থেকে অত রক্ত যে কেমন করে পড়ল সে যেন কল্পনাও করা যায় না।

অশিক্ষিত নির্বোধ জীবন, বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই অথচ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সখ আছে। জড়িবুটি ও হাতুড়ের ওষুধে অখণ্ড বিশ্বাস। ঐ তো লোক হরিহর, একান্ত ভাবে ক্যাবলা চেহারা, হাতে বড় বড় নোখ এবং হাসবার আগেই খৈনী-পোড়া মাড়ি বেরিয়ে পড়ে—ওর পেটে পেটে যে এত, সে-কথা কে ভাবতে পেরেছিল। ওই সব বিজ্ঞাপনওয়ালা আর এই সব স্বামী—এদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত, এরা হত্যাকারীর দল।

কিন্তু আজ ১২ই আগষ্ট। ম্যার্গারেট স্যাঙ্গারকে মহাত্মাজী কী বলেছিলেন? যার সামর্থ্য নেই সন্তানকে বড় করে তুলবার, সংযম ছাড়া তার গত্যন্তর কোথায়?

এডিথের চমক ভাঙল। ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ হল—খুলে গেল সামনেকার কাঠের গেটটা। কাঁচভাঙা ল্যাম্পপোষ্টের খানিকটা ক্ষীণ আলোক ছড়িয়ে পড়েছে লনের ওপর—সেই আলোয় দেখা গেল তিন-চারটি মেয়ে এসে ঢুকেছে। মহকুমা-শহর নিশ্চিন্ত-নগরের একদল আধুনিকা।

স্যাণ্ডেলের চটাচট্ ধ্বনির কোরাস তুলে মেয়েরা উঠে এল বারান্দায়, হাত তুলে নমস্কার জানালে।—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—নমস্কার! বেশ তো, আসুন, আসুন।

—সারাদিন পরে আপনি বিশ্রাম করছিলেন, হয়তো বিরক্ত—

—না, না, বিরক্ত কী। বসুন, বসুন। আনোয়ার—আরো তিন চার পেয়ালা চা দিয়ে যাস বাবা।

মেয়েরা সবাই বসল। দুজন চেয়ারে, বাকী দুজন বেঞ্চিতে। যে মেয়েটির বয়স সব চাইতে অল্প, সেই বললে, সত্যি আপনি একটু বিশ্রাম করছিলেন—

—আমাদের আর বিশ্রাম!—এডিথ ক্লান্তভাবে হাসল: ডাক্তারের কী বিশ্রাম করবার উপায় আছে বলুন। পেশেণ্টের বাড়ি থেকে ডাক এলেই ছুটতে হবে—তার রাতও নেই, দিনও নেই।

গিন্নী-বান্নী গোছের ভারিক্কী একটি মেয়ে কথা বললে। কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতের ভারী ভারী সোনার গয়নায় সৌভাগ্যের ব্যঞ্জনা। ভরা গাল দু'টি মেদের সমৃদ্ধিতে চিক্ চিক্ করছে: তবু বেশ আছেন আপনারা। স্বাধীন জীবন—আমাদের মতো লাথি-ঝাঁটা খেয়ে তো স্বামীর ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয় না।

—স্বাধীন !—এডিথ ম্লান হাসল। সুন্দর মুখের ওপর দিয়ে ছায়া ভেসে গেল মুহূর্তের জন্যে, চোখের পাতা হু'টো যেন ভারী হয়ে আসবার উপক্রম করলে মাত্র এক পলক। স্বাধীন কি সেই হতে চেয়েছিল! ঘরের স্বাদ সে পেয়েছিল, তাই পথের হুঃখ আজ তার কাছে খুব উপভোগ্য বলে মনে হয় না।

কিন্তু এডিথ নিজকে সামলে নিলে। ম্লান হাসিটা কৌতুকোজ্জল হয়ে আরো খানিক বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল।—কই, আপনাকে দেখলে লাথি-ঝাঁটা খাওয়া চেহারা বলে তো সন্দেহ করতে পারে না কেউ। বরং প্রচুর ঘি-হুধ না খেলে অমন খোল্‌তাই চেহারা হতে পারে না, আমার ডাক্তারী বিদ্যে তো তাই বলছে।

—ধরেছেন ঠিক—উচ্ছল কণ্ঠে হেসে উঠল অন্যান্য মেয়েরা : সাক্ষাৎ একটি যথ আপনি অমলা-দি। ডাক্তারের চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া সহজ!

হাসি থামলে সব চাইতে অল্পবয়সী মেয়েটিই আবার কথা বললে। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে, দেখলে ষোলো-সতেরো বছরের বেশি বলে মনে হয় না। কিন্তু চোখের সোনার চশমা যেন তার বয়স খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে—আন্দাজ কুড়ি থেকে বাইশ বছর বয়স হবে মেয়েটির।

—ও-সব আলোচনা থাক। এবার মিস্ সান্যালের সঙ্গে আমরা পরিচয় করে নিই সর্বপ্রথমে। ইনি অমলা দি'—উকিল পূর্ণ বাবুর অর্ধাঙ্গিনী—

—নমস্কার।

পূর্ণ বাবুর অর্ধাঙ্গিনী বিগলিত হয়ে বললেন, নমস্কার। কিন্তু

অর্ধাঙ্গিনী বললি কি রে ? বরং বলা উচিত ছিল অমুক বাবু এঁর অর্ধাঙ্গ—

আবার খানিকটা অকারণ উচ্ছলিত হাসি। এডিথের মনে হল অমলা-দি'র হাসির ধরণ অনেকটা পুরুষের মতো। ...

অল্পবয়সী মেয়েটি এবারে ছোট্ট একটু ধমক দিলে। বোঝা গেল আকারে প্রকারে এবং হয়তো বা বয়সে ছোট হলেও—মেয়েটি ছোট নয়, বরং সেই এদের দলনেত্রী।—কী খালি খালি হাসছ তোমরা সব! উনি কী ভাবছেন বলো দেখি ?

এডিথ বললে,—না—না, না, আমি কিছুই—

—হয়তো ভাবছেন না, কিন্তু একটা স্বাভাবিক ভদ্রতার দিক থেকে আমাদের তো ভাবা উচিত। কিন্তু সে যাক—সকলের পরিচয়টা দিয়ে নিই আগে। এ হচ্ছে সন্ধ্যা ঘোষ, এখানকার স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাষ্টার রমাপদ বাবুর বোন—মহিলা সমিতির সেক্রেটারী। এ অনিলা দত্ত এবং আমি পূরবী দাশগুপ্ত, আমাদের দু'জনের পেশাই এক, অর্থাৎ এখানকার গার্ল-স্কুলে আমরা পড়াই।

—নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার—

আনোয়ার চা এনেছিল। এডিথ বললে, নিন, চা নিন আপনারা।

সবাই চা নিলে, একটু দ্বিধা করে সন্ধ্যা অবধি নিলে। দাদা কোনো কুসংস্কার মানেন না, সুতরাং বৌদির জন্যে ভীত হবার কিছু বিশেষ নেই। কেবল নিলেন না অমলা-দি'—একে ক্রীশ্চানের বাড়ি, তার উপরে মুসলমানের চা—গোরু আর শূয়োরের রাজ-যোটক হয়েছে। অমলা-দি' আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে যতই মেলামেশা করুন কিংবা যতই প্রগতির কথা বলুন না কেন, এতখানি বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষেও শক্ত।

অমলা দি' বললেন, থাক, চা আর আমি নাই খেলাম।

এডিথ হাসল : কেন, আমাদের চা খেতে আপত্তি বুঝি ?

—না, না, সে সব কিছু নয়—অমলা দি' একটা ঢোক গিলে কাষ্ঠ-হাসি হাসলেন : আমার আবার অম্বল আছে কিনা, অসময়ে চা সহ্য হয় না। আমার সঙ্গে পানের ডিবে আছে তা থেকে দু'টো পান খাই বরং—কী বলেন ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তার জন্যে কি আমাকে অনুমতি দিতে হবে ?

পূরবী যেন ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট স্যাণ্ডেল দু'টো মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললে, রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথাটা সেরে নিয়ে এখন মিস্ সান্যালকে বোধ হয় বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত।

অমলা-দি' একসঙ্গে দু'টো পান মুখে দিয়ে বললেন, বেশ বেশ। এক থাবা চুণ মুখে দিতে গিয়ে গালের পাশে খানিকটা চুণ লেগে রইল।

এবার কথা বললে সন্ধ্যা—মহিলা-সমিতির সেক্রেটারী হিসেবে আলোচনাটা সুরু করবার দায়িত্ব তারই। হাতের পোর্টফোলিয়ো থেকে খান কয়েক কাগজ-পত্র বার করলে সে, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, আমাদের এখানে একটা মহিলা-সমিতি আছে।

—বেশ, ভালো কথা।

—আপনাকে তার মেম্বার হতে হবে।

—বেশ, মেম্বার হবো। চাঁদা কত ?

—অ্যাড্মিশন দু'টাকা—চাঁদা চার পয়সা করে মাসে।

—আচ্ছা, এক্ষুনি আমি মেম্বার হয়ে যাচ্ছি। আনোয়ার, রাইটিং টেবিলের ওপর থেকে আমার ব্যাগটা দিয়ে যা তো বাবা—

পূরবী হেসে ফেলল।—আপনি তো বেশ লোক। কথা পাড়তে না পাড়তেই মেম্বার হতে রাজী হয়ে গেলেন। আর শুধু রাজী নয়—একেবারে নগদ চাঁদা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। আজকালকার দিনে সভা-সমিতির মেম্বারসিপের জন্যে এমন আগ্রহ তো দেখা যায় না কোথাও।

এডিথ বললে, দেখা হয়তো যায় না। কিন্তু এত রাত্রে আপনারা কষ্ট করে আমার কাছে যখন এসেছেন এবং সামান্য তিনটে টাকারই যখন মামলা, তখন ঝামেলাটা চট্‌পট মিটিয়ে ফেলাই ভালো নয় কি?

সন্ধ্যা হাসল, অমলাও হাসলেন। সন্ধ্যা বললে, তা হলে রসিদ দিই?

পূরবী কিন্তু হাসতে পারল না। তার মনের মধ্যে কোথায় একটা অলক্ষ্য কণ্টক খচ-খচ করে উঠেছে। বললে, আপনি শুধু ঝামেলা মেটাবার জন্যেই চট্‌পট চাঁদাটা দিয়ে আমাদের বিদায় করতে চাচ্ছেন?

এডিথ চোখ তুলল।—তার মানে?

পূরবী সোনার চশমার ভেতর দিয়ে তাকালো এডিথের মুখের দিকে: মানে অত্যন্ত সহজ। সমিতির উদ্দেশ্য কী, কী তার কাজ—কিছু না জেনেই আপনি অসংকোচে এর সদস্য হতে চাচ্ছেন কী করে?

পূরবীর গলায় প্রচ্ছন্ন খানিকটা উত্তাপ যে আছে, দলের প্রত্যেকে সেটা অনুভব করতে পারল। রসিদ লিখতে লিখতে থেমে দাঁড়ালো সন্ধ্যার কলম।

—অঃ, এই কথা।—এডিথ হাসল: দেখছি সমিতির সভানেত্রী আমাদের এস্‌-ডি-ও সাহেবের বিবি মিসেস্ এল, আহম্মদ। এর পরে তো সমিতির উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ভাববার কিছু নেই। চোখ বুজে ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করলেই চলে।

পূরবীর সর্বাঙ্গে বিদ্রোহ দেখা দিল : তার মানে আপনি বলতে চান—

—আমি কিছুই বলতে চাই না—এডিথ খানিকটা অবজ্ঞাভরেই যেন তিনখানা নোট সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিলে : আপনাদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবার কিছুই তো নেই বাস্তবিক। নারী জাতির উন্নতি হোক—নারী জাতি প্রগতি লাভ করে ধন্য হোক—এ তো চিরকালের খাঁটি কথা। আপনাদের আদর্শ সম্বন্ধে নারী হিসাবে আমার স্বাভাবিক যা সহানুভূতি থাকা উচিত, তাই আছে।

ঝড়ের মেঘ দেখা দিল পূরবীর মুখে :—আপনি কি আমাদের অপমান করতে চান ?

—অপমান !—এডিথ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠল : কে কাকে অপমান করতে পারে বলুন। অপমান নির্ভর করে কে কতখানি তাকে অনুভূতির মধ্যে স্বীকার করে নিতে পারে তারই ওপর। নইলে আজ কংগ্রেসের নেতাদের যখন বন্দী করা হল—চূড়ান্ত অপমানে সমস্ত দেশের মুখ যখন কালো হয়ে গেল—তখনও তো এস্-ডি-ওর পত্নীকে সভানেত্রী করে আমরা নারী-প্রগতির স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু সে কথা যাক। আপনার রসিদ লেখা হয়েছে মিস্ ঘোষ ? আর কত রাত করবেন আপনারা ?

সন্ধ্যা চমকে রসিদটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসল পূরবী। একটা থাবা দিয়ে সে সন্ধ্যার হাত থেকে রসিদখানা কেড়ে নিলে। বললে, থাক সন্ধ্যা। তিনটে টাকার জন্যে এ ভাবে অপমান সইবার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না ! ধন্যবাদ, আপনাকে মেম্বার হতে হবে না। আর রাতও আমরা করব না—চললাম, নমস্কার।

এডিথ তখনো হাসছে। পূরবীর অগ্নিবর্ষী মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ব্যাপার কী মিস দাশগুপ্ত, এভাবে হঠাৎ চটে উঠলেন কেন?

—ব্যাপার কী, সে তো আপনি নিজেই সব চাইতে ভালো করে জানেন—উত্তেজনায় পূরবী থরথর করে কাঁপছে: কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করা হয়েছে বলে বেদনা বা বিক্ষোভ জানানোর কথা আপনার মুখে অন্তত শোভা পায় না।

এডিথের মুখের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল: আমার অপরাধ?

দলের অন্যান্য সকলে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ব্যাপারটা অথবা কথাবার্তাগুলো কিছুই তারা ভালো করে বুঝতে পারছে না—সবই তাদের কাছে দুর্বোধ্য একটা নাটকের মতো বলে মনে হচ্ছে। অনিলা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, এইবারে আলগা ভাবে পূরবীকে ছুঁয়ে বললে, কী করছ?

কিন্তু পূরবীর মাথায় যেন খুন চেপেছে। তীব্র গলায় বললে, অপরাধ! নিজের ধর্ম ছেড়ে যারা মনিবের ধর্মকে মেনে নিয়ে দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখে, তাদের মুখে এ সব কথা প্রহসনের মতোই শোনায়।

—তাই নাকি!—এডিথ হঠাৎ তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। তার মুখের উপর থেকে সমস্ত মেঘ কেটে গেছে—তার অপূর্ব সুন্দর দেহ যেন হিল্লোলিত হয়ে উঠছে রূপের তরঙ্গে। বললে, আপনি এখনো ছেলেমানুষ আছেন মিস্ দাশগুপ্ত। আপনার কথায় আমি রাগ করব না।

ব্যঙ্গভরে পূরবী বললে, ধন্যবাদ—আপনার উদারতা আমায় মনে

থাকবে। কিন্তু আমি ছেলেমানুষ কিনা সে বিচার আপনার করবার দরকার আছে বলে মনে করি না।

অমলা-দি' এতক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—আহা-হা,—কী করছ পূরবী, খালি খালি ঝগড়া করছ কেন? দেখুন মিস্ সান্যাল—

পূরবী কঠিন গলায় বললে, না, ঝগড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এর পরে এখানে থাকবারও আর দরকার নেই অমলা-দি'—খালি খালি ওঁর মূল্যবান সময়ই নষ্ট করা হচ্ছে। আচ্ছা, চললাম আমরা, নমস্কার।

হতভম্ব দলটিকে এক রকম টেনে নিয়েই পূরবী নেমে গেল বারান্দা থেকে। একরাশ স্যাণ্ডেলের চটাচট্ শব্দ লন পেরিয়ে, গেট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত-নগরের খোয়া-বাঁধানো রাস্তায়।

এডিথ অনুজ্জ্বল আলোকে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দাতে। একটা পরুষ-গম্ভীর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রির বাতাসে। আজকে বারোই আগষ্ট—খবর বলছে অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিয়ো। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাইতে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে—হাঙ্গামা বেধেছে শহরের নানা অঞ্চলে। আকাশের কোণে যেখানে একরাশ কালো মেঘ ঘন হয়েছিল, সেখানে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে ক্রমাগত। রাত্রে বোধ হয় ঝড়-বৃষ্টি হবে খানিকটা। শহরের এ পাশে দিগন্ত-প্রসারিত কালো প্রান্তরের বুকে তীব্র স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে—ডাকছে কোলা ব্যাং, কাঠ ব্যাং, কটকটে ব্যাং আর সোনা ব্যাং—উল্কামুখীর মুখ থেকে দপ দপিয়ে জ্বলছে আলেয়ার আলো!

* * * *

বিনোদবাবু তাঁর বসবার ঘরে জাজমেণ্ট লিখছিলেন।

পুরোনো ব্যাপার। গরীব আসামী বড়লোক ফরিয়াদীর ক্ষেতে গাই নামিয়ে তার নতুন ফসলের শীষ অর্ধেক সাবাড় করে দিয়েছে। এবং আসামীকে হাতে-হাতেই ধরে ফেলা হয়েছে, তার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণেরও অভাব নেই।

কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে আসামী যে-কথা বলেছে তাতে বিনোদবাবুর মতো জাঁদরেল হাকিমও চিত্ত-চঞ্চলতা বোধ করেছেন। লোকটা অত্যন্ত গরীব—এত বেশি গরীব যে, এক বেলা ভাতও তার জোটে কিনা সন্দেহ। বহু কাল আগে ফরিয়াদীর কাছ থেকে সে দশ টাকা ধার করে, কিন্তু লেখাপড়া জানত না বলে ফরিয়াদী তাকে পঞ্চাশ টাকার কাগজে টিপ-সই করিয়ে নেয়। সুদে আসলে দাঁড়ায় দেড়শো টাকার ওপরে—তার ভিটে পর্যন্ত যায় যায়। এর পরে আসে ঋণ-সালিশী বোর্ড, মোট পঁচিশ টাকায় চেয়ারম্যান মামলার নিষ্পত্তি ক'রে দেন। এই পঁচিশ টাকার কিস্তি চালাবার সামর্থ্যও তার নেই। অথচ ফরিয়াদীর পাকেচক্রে তার যথাসর্বস্ব গেছে। যুদ্ধের বাজারে জন-মজুরের ভাত জোটেনা—শেষ সম্বল একটা গাই, তার চরবার ভুঁই নেই, জাবনা কিনবার পয়সা নেই। তাই রাগে-দুঃখে সে ফরিয়াদীর তিনশো বিঘে ধানী জমি থেকে তার গোরুকে এক পেট ধান খাইয়েছে। হুজুর তাকে যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন—তার কোনো আপত্তি নেই, সে তা মাথা পেতেই নেবে। অসংকোচেই তার অপরাধ সে কবুল করে যাচ্ছে।

বিনোদবাবু ভাবছিলেন, কী করা যায়।

আসামী পক্ষের সাক্ষী ছিল লালচাঁদ মণ্ডল। কটা-রঙের মাথার চুল—কঠিন চোয়াল, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ। সারা গায়ে নীল শিরা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। লোকটা বেপরোয়া—কাউকে ভয় করেনা

বিশেষ। হাকিমকে নয়, উকিলকে নয়, আদালতকেও নয়। খুব জোরালো সাক্ষ্য দিয়েছিল লালচাঁদ।

—হুজুর, আপনারা বিচার করবেন। এ বেচারা গরীব, এর সহায়-সম্বল কিছুই নেই। এক বেলা ভাতও এর জোটেনা। তাই এর ওপরে এত জুলুম। এর যথাসর্বস্ব ফরিয়াদীর পেটে গেছে। এ যদি তা থেকে সিকি কাঠা ধান গোরুকে খাইয়েই থাকে, তার জন্যে একে কি শাস্তি পেতে হবে ?

ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তার কালীসদন বাবু চটে উঠেছিলেন: তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার জবাব দাও। তুমি হাকিম নও—তোমাকে মামলার রায় দিতে হবে না।

লালচাঁদের ছোট ছোট চোখ যেন জ্বলে গিয়েছিল।

—তা জানি মোক্তার-বাবু। আমি হাকিম নই—কিন্তু সাক্ষী তো বটে। যা সত্যি তা আমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলব, কারো চোখ-রাঙানির ভয় করব না। আজ এই গরীবের ওপর যদি সুবিচার না হয় তাহলে আদালতের ওপরে আমরা ভরসা রাখব কী করে ?

কিন্তু বিনোদবাবুর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কী আশ্চর্য ভাবে বদলে গেছে দিন। কুড়ি বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। তখন দেহাতী মানুষ, বিশেষ করে উত্তর-বাঙলার এই "বাহে" সম্প্রদায় আইন-আদালতকে কী ভয়ানক ভয় করত। সাক্ষীর সমন পেলেই থর থর করে কাঁপত তারা—ভাবত, এইবারেই বুঝি তাদের জিঞ্জীর পরিয়ে কালাপানির পারে পাঠিয়ে দেবে ! তা ছাড়া আদালতে একবার জেরার সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই হল। উকিলের একটি ভ্রূকুটিতেই পাকা ঘুঁটি তারা কাঁচিয়ে ফেলত, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হলেও

একটি ধমক খেয়েই সব কিছু গোলমাল করে ফেলত তারা—খুনী মামলার আসামীও বে-কসুর খালাস পেয়ে যেত।

আজ কারা এসব এল, কোথা থেকেই বা এল। আইন-আদালতের সেই সব থম-থম করা উদাত্ত মহিমা। শামলা-পরা উকিল। কাঠগড়া, গম্ভীরমুখ হাকিম, কনেষ্টবল, টানা পাখা, নকীবের হাঁক-ডাক, আইনের বই আর নথি-পত্তরের স্তূপ; বটগাছ-তলায় উকিল, টাউট আর সাক্ষীদের রহস্যময় ফিস্‌ফাস্‌ আলোচনা। সবশুদ্ধ মিলিয়ে কী আশ্চর্য ভীতি-রোমাঞ্চিত একটা পরিবেশ। যেন একটা আত্মিক অলৌকিক আবহাওয়া—এখানে এসে ওরা বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে তাকাত —যেন কশাইখানার একদল পশু।

সেই ওরা আজ কী বলছে! বিচারের কথা, আইনের কথা! কলিযুগ কি বদলে গেল না কি? নেংটি-পরা গান্ধী মহারাজ সম্পর্কে বিনোদবাবুর যতটা অনুকম্পাই থাক না কেন, লোকটার যে ক্ষমতা আছে সে কথা মানতেই হবে।

কালীসদন রোষরক্ত চোখে বললেন, ইয়োর অনার, সাক্ষী অত্যন্ত ইম্পার্টিনেণ্ট!

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল আসামী পক্ষের মোক্তার ব্রজেন। নতুন পাশ করে এসেছে, খদ্দর-পরা, জেল-খাটা সেদিনকার ছোকরা। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, সিনিয়ার মোক্তার কালীসদনের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল সে: প্রত্যাহার করুন।

বিনোদবাবু ধমক দিয়ে বললেন, অর্ডার, অর্ডার।

আদালতে শান্তি ফিরে এল, কিন্তু মনের মধ্যে ক্রমাগত একটা তীব্র অশান্তি বোধ করছেন বিনোদবাবু। কোথায় যেন কিসের একটা

অশুভ ব্যঞ্জনা। মাটির তলায় কোন্ একটা অলক্ষ্য স্তরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জোড় আল্‌গা হয়ে গেছে না কি !

জাজমেণ্ট লিখতে লিখতে একবার খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন বিনোদবাবু। নীচে ছোট ছেলে প্রমোদের পড়বার ঘর। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে এবার—রাত জেগে পড়াশুনো করে। ছেলেটার মতিগতি এত দিন ভালোই ছিল—লেখাপড়ায়ও মন্দ ছিল না, মাষ্টারেরা আশা করেছেন স্কলারশিপ একটা পেলেও পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছুদিন থেকে মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রমোদ আজকাল একটু রাত করে বাড়ী ফেরে—দু'-তিনটে অকর্মা ছেলে আসে তার কাছে, নানা রকম তর্ক করে। এলোমেলো ভাবে বিনোদবাবু যা শুনেছেন তাতে মনে হয় সেগুলো পলিটিক্স ছাড়া আর কিছুই নয়।

দু' একবার ভেবেছেন ছেলেটাকে ডেকে ধমকে দেবেন, শাসন করে দেবেন খানিকটা। কিন্তু তাতেও বাধে। এইখানেই অপরিসীম একটা দুর্বলতা তাঁর আছে। বাইরে জবরদস্ত হাকিম বলেই বোধ হয় পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর প্রতিপত্তিটা কিছু পরিমাণে ক্ষীণ—প্রকৃতির প্রতিশোধ। অথবা অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ মানুষ—আত্মীয়-স্বজনের কালো মুখ তিনি দেখতে পারেন না। কয়েকবার বলি-বলি করেও প্রমোদকে কোন কথাই তিনি বলতে পারেননি।

তার পরে সে দিন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে চা-খাওয়ার সময় আই-বি ইন্‌স্‌পেক্টর এমদাদ হোসেন তাঁকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দু'জনে একান্তে দাঁড়িয়ে দু'টো সিগারেট ধরাবার পর এমদাদ হোসেন বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—বলুন।

—প্রমোদ কিন্তু খারাপ দলে মিশছে—ওর মাথায় পলিটিক্সের পাগলামি ঢুকছে। আমি যে-সব রিপোর্ট পেয়েছি, সেগুলো ভালো নয়।

—সে কি কথা!—বিনোদ বাবুর বুকের রক্ত মুহূর্তে জল হয়ে গিয়েছিল—মনে হয়েছিল—তাঁর ব্লাড-প্রেসারটা আবার বুঝি বেড়ে উঠবে। হৃৎপিণ্ড দু'টো ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়েছিল—তা কি হয়?

—হয়, মিষ্টার চক্রবর্তী, হয়। আমরা 'আই-বি'র লোক—এমন মানুষের এমন খবর দিতে পারি যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না মশাই। এই নিশ্চিন্ত-নগরের কোন্ মেয়ে কাকে ক'খানা প্রেম-পত্র মাসে মাসে লেখে সে খবর অবধি জানি—আর আপনার ছেলে যে পলিটিক্স করবার মতলবে আছে, সেটুকুও বুঝতে পারব না?

—কিন্তু—

—কিন্তু নয় মিষ্টার চক্রবর্তী—এমদাদ হোসেন অনুকম্পার ভঙ্গিতে হেসেছিলেন: আমি যা বলছি তা পাকা খবর। দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদের কান পাতা, কাজেই আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। আগে-ভাগেই আপনাকে বলে রাখছি। বেশি বাড়াবাড়ি হলে সার্কেল অফিসারের ছেলে বলেও গভরমেণ্ট রেয়াৎ করবে না।

বিনোদবাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন খানিকক্ষণ। ক্লাবের অমন মনোরম আড্ডা, অফিস এবং পরচর্চা মুহূর্তে কটু আর বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর গায়ে একশো-পাঁচ ডিগ্রী জ্বর উঠেছে, তাঁর মাথায় ব্রেন-কনকাশন হয়েছে, তাঁর হাতে-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরেছে,

হাঁটুতে বাত দেখা দিয়েছে—এবং বুকে ডবল-নিমোনিয়ার অতর্কিত আক্রমণও অসম্ভব নয় !

ঝড়ের মতো বেগে বিনোদ বাড়িতে এলেন। বজ্রগর্ভ স্বরে ডাকলেন, প্রমোদ !

নিরীহ একটি ষোলো-সতেরো বছরের প্রিয়দর্শন ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় বড় চোখ দু'টি শিশুর মতো সরল—মুখখানা দেখলে শান্ত আর দুর্বলচিত্ত বলে মনে হয়, মনে হয়, ছেলেটার কবিতা লেখবার কিংবা ছবি আঁকবার অভ্যাস আছে। দু'টো আঙুলে কালি, এক হাতে একটা স্কেল। জ্যামিতির এক্সট্রা করছিল বসে বসে। বিনোদবাবু সন্দিগ্ধ হাকিমী দৃষ্টিতে নিজের ছেলের আপাদমস্তক দেখে নিলেন। নাঃ, অসম্ভব। এর ভেতরে রাজনীতির আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গও থাকতে পারে না কোনোখানে।

—ডাকছিলেন বাবা ?

—হু, ডাকছিলাম। তুই নাকি পলিটিক্সের দলে মিশেছিস ?

প্রমোদের কোমল শান্ত মুখখানা যেন শক্ত হয়ে উঠল : কে বলেছে ?

—আই, বি ইনস্পেক্টর।

প্রমোদের সমস্ত চেহারাটা মুহূর্তের জন্যে বদলে গেল কি ? না, বিনোদবাবুর চোখের ভুল ? পরক্ষণেই শিশুর মত তরল আর নির্মল গলায় সে হেসে উঠল।

—ওদের কথা আপনি বিশ্বাস করলেন বাবা ? ওরা কী না বলে।

বিনোদের মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে যেন ভার নেমে গেল একটা। বললেন, তা বটে, তা বটে। কিন্তু তুই নাকি যার তার সঙ্গে মিশছিস্ ?

—বাঃ, যার তার সঙ্গে মিশতে যাব কেন আমি।—প্রমোদ অকৃত্রিম

ভাবে সত্য কথা বলে গেল, কার সঙ্গে হয়তো একটা কথা বলেছি আর ওরা ধরে নিয়েছে যে আমি পলিটিক্স করছি। আমার কি আর কোনো কাজ নেই বাবা ? পরীক্ষা দিতে হবে না আমাকে ?

—তা বটে, তা বটে।—হঠাৎ এমদাদ হোসেনের ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে বিনোদবাবুর সমস্ত মনটা ভরে গেল। আই-বির লোকগুলোর স্বভাবই এই—অকারণে সুস্থ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই ওদের পেশা। প্রমোদ অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী ছেলে—বিশেষ করে তাঁরই তো ছেলে! সে কখনো ওসব কু-পথে যাবে, এ কি বিশ্বাসযোগ্য! বিশেষ করে বিনোদবাবুর বাড়িতে সামান্যতম রাজনীতিও তো কখনো প্রশ্রয় পায়নি।

—আচ্ছা পড়গে। কিন্তু সাবধান, কখনো মিশবিনে বাজে লোকের সঙ্গে।

—আপনি পাগল হয়েছেন বাবা!—প্রমোদ পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

পরের দিন এমদাদ হোসেনের দেখা হতেই বিনোদবাবু বললেন, ছেলেটাকে খুব করে ধমকে দিয়েছি মিষ্টার হোসেন।

মিষ্টার হোসেন চাপ-দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে হাসলেন: ভালোই করেছেন। লেখা-পড়া করুক, জীবনে উন্নতি করুক—এসব বদখেয়াল যেন মনের কোথাও ঠাঁই না দেয়। আর জানেনই তো আমাদের অপ্রিয় কর্তব্য—বেগে সাইকেল চালিয়ে এমদাদ হোসেন এস-ডি-ওর বাংলোর দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু আজ রাত্রে জাজমেণ্ট লিখতে লিখতে হঠাৎ প্রমোদের ঘরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। সমস্ত সহর ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত প্রায়

এগারোটার কাছাকাছি। নিশ্চিন্ত-নগর মিউনিসিপ্যালিটির অষ্টাবক্র চেহারার কাঠের পোষ্টগুলোর ওপরে কাচ-ভাঙা আবরণের ভেতরে মিটমিটে কেরোসিন ল্যাম্পগুলো একটার পর একটা নিবে যাচ্ছে। মফঃস্বল সহর নিশ্চিন্ত-নগরের সমস্ত কোলাহল আর খোয়া-ওঠা পথে টর্মটমের শব্দকে ছাড়িয়ে মাঠের দিক থেকে ছড়িয়ে পড়েছে শেয়াল আর ঝিঁঝিঁর তীব্র ঐকতান, আর চারদিকের এই স্তব্ধতার ভেতরে প্রমোদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু এখন—এই রাত্রে তার ঘরে কথা বলছে কে?

বিনোদবাবুর অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল। প্রাইভেট টিউটর চলে গেছেন সাড়ে ন'টার পরেই। বাড়ির আর সকলেই ঘুমিয়েছে বা ঘুমোবার উপক্রম করছে। তা ছাড়া চাকর-বাকর বা আর কারুর পড়বার সময় ওঘরে যাওয়ার হুকুম নেই, পরীক্ষার ক্ষতি হবে প্রমোদের। তা হলে?

বিনোদবাবু কাণ পাতলেন। টুকরো টুকরো কথার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটা অনিশ্চিত সন্দেহে সমস্ত চেতনাটা পীড়িত হয়ে উঠল।

অসমাপ্ত জাজমেণ্ট রেখে বিনোদবাবু জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন —ভালো করে ঝুঁকে তাকালেন প্রমোদের ঘরের দিকে। গলার স্বর কখনো উঠছে, কখনো বা অত্যন্ত নীচু পর্দায় নেমে যাচ্ছে। ব্যাপার কী?

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বিনোদবাবু দেখলেন, দু' তিনটি ছেলে নেমে এল নীচে, আবছায়া আলোতে ভালো করে তাদের চেনা গেল না। প্রায় নিঃশব্দ পায়েই তারা সদর রাস্তার দিকে হেঁটে চলে গেল।

এমদাদ হোসেনের কথাগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমক দিলে। তাদের ভেতরে কোনো সত্যি নেই তো? মুহূর্তে বিনোদবাবু ব্রেন-কন্‌কাসন, ব্লাডপ্রেসার, বাত আর একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর যেন এক সঙ্গেই অনুভব করলেন।

একটা অসহ্য অস্থিরতায় উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর পায়ে চটিটা টেনে নিয়ে বাইরের ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে নেমে এলেন নীচে। এই সিঁড়ির মুখেই প্রমোদের পড়বার ঘর। জানলা দিয়ে বিনোদ দেখলেন, প্রমোদ এক মনে কী লিখে চলেছে।

—প্রমোদ?

প্রমোদ চমকে উঠল।—বাবা!

—হুঁ, আমি।—বিনোদবাবু কঠিন মুখে বললেন, কারা এসেছিল?

—ওঃ, ওরা?—প্রমোদ যেন ছোট একটা ঢোক গিলল: আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড।

—ক্লাস-ফ্রেণ্ড? তা এত রাত্রে কেন?

—অঙ্ক কষতে এসেছিল।

—অঙ্ক কষতে?—বিনোদবাবু তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে মিথ্যা কথা বলছে প্রমোদ—এত দিন পরে তাঁর মনে হল প্রমোদও মিথ্যে কথা বলতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ আর সহজাত একটা দুর্বলতার জন্যেই হয়তো প্রশ্নটাকে ভালো করে যাচাই করে নিতে পারলেন না বিনোদবাবু।

—সে যাক, এত রাত্রে ওদের আসতে বারণ করে দিয়ো।—বিনোদ পেছন ফিরলেন।

—দেবো।—প্রমোদ লেখায় মন দিলে।

চটের শব্দ করে বিনোদবাবু ফিরে এলেন দোতলায়। শরীরের মধ্যে একটা তীব্র অস্বস্তি। মনের চিন্তাগুলো যেন সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। এলোমেলো কতগুলো মুখ আর বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনা এখান ওখান থেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সেই লালচাঁদ মণ্ডল। স্বদেশীকরা মোক্তার ব্রজেন বাবু। প্রমোদ কি সত্যি সত্যিই রাজনীতির দলে ভিড়েছে না কি?

আকাশে কালো মেঘে লাল বিদ্যুৎ ঝলসে চলেছে। রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি কিছু একটা হবে নিশ্চয়।

—পাঁচ—

পূরবী আর অনিলা যখন বোর্ডিংয়ে ফিরল তখন পূরবী মুখখানা কেন ফেটে পড়ছে। জামা-কাপড়ও সে ছাড়ল না, কেবল ফিতে থেকে জুতোটা খুলে সে দূরে ছুঁড়ে দিলে, তার পর গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

পূরবী বড়লোকের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই যেমন খেয়ালী তেমনি অভিমানী। বাড়িতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথাও কেউ বলতে পারতনা। ফোর্থ-ইয়ারে পড়বার সময় কলেজ-ইউনিয়ামের ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে ঝগড়া করে কলেজ ছেড়েছিল। বাড়িতে বাবা মৃদু তিরস্কার করলেন, পূরবী ঝগড়া করলে। বললে, তোমার টাকা আমি চাইনা, নিজে স্বাধীনভাবে চলবার শক্তি আমার আছে।

বাবা অনুতপ্ত হয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পূরবী ভোলবার পাত্রী নয়। বাড়ি সে ছাড়লই। খবরের কাগজে ভ্যাকান্সি দেখে দরখাস্ত করে দিলে, এইখানে চাকরী জুটল। স্কুলে তার অগাধ প্রতিপত্তি, হেড্-মিষ্ট্রেস্ থেকে সেক্রেটারী পর্যন্ত তাকে ভয় করেন। নিজের জোরে সে তার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আজ এডিথ্ তাকে একটা মস্ত ঘা দিয়েছে। বিছানার এলিয়ে পড়ে হিংস্র ভাবে পূরবী আঙুল কামড়ে চলল।

. ঘরে দু'খানা খাট। একখানাতে অনিলা, আর একটিতে পূরবীর আস্তানা। দু'জনে সম্পূর্ণ দু'জাতের, তবু একসঙ্গে থাকে বলে পরস্পরের মধ্যে এক ধরণের বন্ধুত্ব আছে। অনিলা ফিট-ফাট, গোছানো। অল্প মাইনের ভেতরে যতটুকু ছিমছাম থাকা যায় সে চেষ্টায় তার ত্রুটি নেই।

একটা বেতের টেবিলে অল্প কিছু প্রসাধনী—ছোট্ট একখানা সুন্দর আয়না। ব্র্যাকেটে ফরসা শাড়ীগুলো যত্ন করে গুছানো, একটি রঙীন প্যারাসোল। দুটি ফুলদানি আছে, তবে অভিজাত ফুলের অভাবে তাতে আপাতত গোটাকয়েক সপত্র কদমফুল শোভা পাচ্ছে—ইস্কুল থেকে আসবার সময়ে জোগাড় করে এনেছে অনিলা। তা কদমফুল নেহাৎ মন্দ মানায় নি, আর আকাশে ঘন মেঘের নীলাঞ্জন—বেশ একটা সময়োচিত কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—একটা মৃদু সুগন্ধ ভাসছে ঘরের বাতাসে। বইয়ের সেল্‌ফে সচিত্র মেঘদূতের একটি সংস্করণ, খানকয়েক উপন্যাস আর ক্লাসের টেক্‌সট্ বই। ফুল-তোলা রঙীন বেড্-কভারে বিছানাটি ঢাকা।

পূরবীর ব্যবস্থা অন্য রকম। একটা ট্রাঙ্কের ওপর জামা-শাড়ীগুলো স্তূপাকার হয়ে আছে। ধবধবে শাদা চাদর বিছানো শয্যা—তাতে আধখোলা বই আর কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে। অনিলা অনেকবার গুছিয়ে দিয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি—পূরবীর স্বভাব নোংরা। প্রসাধনের বালাই নেই বললেই চলে। সেল্‌ফে রাশি রাশি বই জমে আছে, আর আছে চামড়ার কাজ করবার সরঞ্জাম। দেশ-নেতাদের দু'-তিনখানা ছবি শোভা পাচ্ছে মাথার কাছে। পূরবীর এই অগোছালো বিশৃঙ্খলার পেছনে কোথায় যেন একটা আত্ম-সচেতনতার ইঙ্গিত আছে, যেন মেয়েদের স্বভাবসুলভ রুচিবাগীশতাকে সে অনেকটা জোর করেই অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু তার এই রূপ যে তার নিজস্ব ধর্ম নয়, সে পরিচয় মেলে তার এম্ব্রয়ডারীতে, তার ঝকমকে চামড়ার কাজে।

অনিলা ব্র্যাকেট থেকে একটা শাড়ী নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলে: হাত-পা না ধুয়েই এমন করে শুয়ে পড়লে যে?

—এমনিই, ভালো লাগছে না।

অনিলা অল্প একটু হাসল : খুব ঝগড়া করে এলে তো ?

পূরবীর চোখ জ্বলে উঠল। তিক্ত ভাবে বললে, ঝগড়া করব না ? ব্যবহারটা একবার দেখলি ?

—কথাটা কিন্তু তুমিই খুঁচিয়ে তুললে।

—খুঁচিয়ে তুললাম ? মোটেই না। কী অসাধারণ দাম্ভিক ! আমরা যেন মানুষই নয় ! কথাটার ধরণ লক্ষ্য করিসনি ? মহিলা-সমিতি ? এস-ডি-ওর স্ত্রী তার প্রেসিডেণ্ট ? তার মানে জিনিসটাই একটা প্রহসন—মাঝে মাঝে নারী জাতির উন্নতি সম্বন্ধে দু'-চারটে ভালো ভালো আলোচনা—তার বেশি কিছুই নয়।

অনিলা মৃদুস্বরে বললে, কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যি নেই কি ?

—হয়তো আছে।—পূরবী বিছানার ওপরে উঠে বসল। তীব্র ভাবে বললে, কিন্তু এই রকম একটা মফঃস্বল শহরের পক্ষে এরও তো দাম কম নয়। যেখানে মানুষের ঘর-সংসার, সিনেমা দেখা, পানচিবানো আর দুপুরে পর-চর্চা ছাড়া আর অন্য কাজ নেই—সেখানে এটা একটা নতুন আলো নিশ্চয়।

—উনি হয়তো আরো বেশি আশা করেন।

—আশা করলেই তো হয় না—পূরবী ঝাঁকিয়ে উঠল : স্থান-কাল বলে একটা জিনিষ আছে তো। রোমকে রাতারাতি ব্যাবিলন করা যায় না। আসল কথাটা কী জানিস ? আমরা এখনো একেবারেই পিছিয়ে আছি—আমাদের যা কিছু চেষ্টা সব ছেলেমানুষী—এইটাই ও প্রমাণ করতে চায়। হাম্‌বাগ !

অনিলা মৃদু হেসে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল। এডিথের ব্যবহার

হয়ত সত্যিই খুব ভাল নয়, কিন্তু একদিক থেকে নিতান্ত মন্দ লাগেনি অনিলার। দু'জনের মধ্যে গভীর আর নিবিড় একটা বন্ধুত্ব সত্ত্বেও মনে হল, এরকম একটা কিছু প্রয়োজন ছিল পূরবীর পক্ষে। পূরবী অত্যন্ত সাধারণ চালে চলে, অত্যন্ত সহজ ভাবে মেশে। কিন্তু সব কিছুর ভেতর দিয়ে প্রবল আত্মপ্রত্যয়—কখনো বা প্রবল একটা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় পূরবীর আচরণে। নিজের সম্বন্ধে অতি-সচেতনা খানিকটা উন্নাসিক করে তুলেছে ওকে ; সকলকে যেন করুণার পাত্র বলে মনে করে—অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের হাত থেকে রাতারাতি সবাইকে মুক্ত করবার জন্যে একটা মহতী ব্রত নিয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে পূরবী।

—রমাপদবাবুর সঙ্গে আলাপ করলি ? টিপিক্যাল্ স্কুল-মাষ্টার। ডেজার্টেড্ ভিলেজ, জন গিল্‌পিন আর বড় জোর কিং লীয়ারের ওপরে আর উঠতে পারলনা। Though vanquished, he argues still —একেবারে নিখুঁত।

অনিলা সংক্ষেপে বলে, হুঁ।

—আর সন্ধ্যা। আধুনিকা হওয়ার ঝোঁক আছে, আই-এও ফেল করেছে বার দুই—অথচ দেখেছিস, খবরের কাগজের একটা পাতা অবধি কখনো পড়ে না। ঘাড়ে গলায় সেরখানেক পাউডার ঢেলে আধুনিকা সাজতে পারে বড় জোর—আর বিলিতী সিনেমা-ষ্টারদের নাম মুখস্ত বলতে পারে। তবু ওকেই মহিলা-সমিতির সেক্রেটারী করতে হল। শেম।

—হুঁ।

—আচ্ছা, অমলা-দি'টা কী রকম বল্‌তো ? গিনি সোনা আর পাকা সোনার ডিস্‌টিংশন ছাড়া আর কিছু বোঝে বলে মনে করিস ? A lump of flesh and fat—ডি-এইচ-লরেন্সের ভাষায় একটা মাংস-মাখন-

খাওয়া কাবলী বিড়াল মনে হয়। যেন গলায় হাত বুলিয়ে দিলে ঘর্-র্ করে ডাকতে সুরু করে দেবে।

এইতো পূরবীর কথাবার্তার নমুনা। অনিলার সব সময়ে ভালো লাগে না—বরং মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়। পূরবী শ্রদ্ধা করতে পারে না—একমাত্র নিজেকে ছাড়া কাউকে স্বীকার করতে পারে না। এমন করে কি কাউকে কাছে টানা যায়? মানুষের আকর্ষণ মানুষের সহজ হৃদ্যতায়। পূরবীকে সকলে ভয় করে—পূরবী অনেক পড়েছে, অনেক খবর রাখে। কিন্তু পূরবীকে কেউ ভালবাসে কি? আজ অনিলার মনে হয়েছে—নিশ্চিন্ত-নগরে এতদিন পরে ওর একচ্ছত্র মানসিক আভিজাত্যের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে—অন্তত ওর চাইতে যে আরো বেশি উন্নাসিক—আরো বেশি এগিয়ে ভাববার ক্ষমতা রাখে। আর এ কথাও মনে হয়েছে—মহিলা-সমিতিকে এডিথ যাই বলুক, অন্তত পূরবী যে অপদস্থ হয়েছে এতে সন্ধ্যা আর অমলা-দি' খুশিই হয়েছে মনে মনে।

মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে অনিলা ভাবল, এক দিক থেকে এ ভালোই হয়েছে বোধ হয়। চার দিকে সবাই এত ছোট যে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পূরবী ঠিক বুঝতে পারছিল না সে কতখানি উঁচু—তার মাথা কতটা অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এবার সে নিজের আয়তনটা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে একটা ধারণা নিতে পারবে নিশ্চয়। এতে পূরবীর উপকারই হবে।

আর বিছানাটার ওপর লম্বা হয়ে পড়ে মনের মধ্যে যেন জ্বলে যাচ্ছিল পূরবী। পিঠের নীচে একরাশ বই-খাতা খচ-খচ করে বাজছে—কিন্তু সেদিকে তার কোনো লক্ষ্য ছিল না। ওই নেটিভ ক্রীশ্চান—হয়তো বা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা তাকে তুচ্ছ করতে পারল আজ! পূরবী যত

বেশি চটেছে, তত বেশি করে হেসেছে অনুকম্পার হাসি। ফিরিঙ্গী ছোঁকরাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়ানো ছাড়া যাদের জীবনে আর কোনো অ্যাম্বিশন্ নেই—তারাও আজ ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূরবীকে উপদেশ দিতে আসে : কী দুঃসাহস!

পূরবী উঠে বসল। নাঃ, ও সব দুশ্চিন্তা থাক। এডিথের সম্বন্ধে মনকে এত বেশি শিথিল করে দেওয়ার অর্থ ওকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দেওয়া। ওর কথা আর সে ভাববেই না। একটা নেটিভ ক্রীশ্চান মেয়ে—ফুঃ। কতটুকু বোঝে!

তিন দিন পরে।

রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তনগর। পূরবীদের বোর্ডিংও তন্দ্রার অতলে নিমগ্ন।

—'বন্দে মা-তরম্'—

পৃথিবীর চমক লাগল। ঝিল্লীরব-মুখরিত নিশ্চিন্ত-নগরের নিশ্চিন্ত পথ-ঘাট চকিত করে হঠাৎ তিন-চারটি কণ্ঠে তীব্র ঝঙ্কার উঠেছে :

—'বন্দে মাতরম্'—

—'কারারুদ্ধ জাতীয় নেতাদের স্মরণ করুন'—

—'আপনার কর্তব্য পালন করুন'—

—'ডু অর্ ডাই'—

পূরবী উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কড়াং কড়াং করে কয়েকটা সাইকেলের শব্দ—ভাঙা ল্যাম্পপোষ্টের আলো কিরণ বিকিরণের প্রহসন করছে—তরল অস্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে সাইকেলগুলো।

হঠাৎ পেছনের একটা সাইকেল থেমে পড়ল। খোলা জানালায় আলোকিত পটভূমির ওপরে একখানা তৈলচিত্রের মতো পূরবীর চেহারাটা সাইকেল-যাত্রীর নজরে পড়েছে। সাইকেল মাটিতে ফেলে সে এগিয়ে এল, তার পর পূরবীর জানালার কাছে গিয়ে বললে, এই নিন—পড়ে দেখবেন।

এক রাশি প্যাম্ফলেট।

কিন্তু প্যাম্ফলেটের দিকে পূরবীর নজর ছিল না। সে বিস্ময়াহত হয়ে ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল : এ কি তুমি!

ছেলেটি মৃদু হাস্যে বললে, হ্যাঁ।

—তুমিও আছো এই দলে?

ছেলেটি তেমনি হাস্যোজ্জ্বল মুখেই বললে, আজ আর আলাদা কারো কোনো দল নেই পূরবীদি, সবাই এক দলে। স্বাধীনতা কে চায় না বলুন?

—কিন্তু তোমার বাবা—

—খুশি হবেন না। সব সময়ে তো সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়। সে যাই হোক—আপনি কাগজগুলো পড়ে দেখবেন—আমার সময় নেই।

ছেলেটি চলে গেল। দ্রুত সাইকেল হাঁকিয়ে অদৃশ্য হল অন্ধকারের মধ্যে। দূর থেকে তখনো ক্ষিপ্রগামী চোঙার শব্দ আসছে :

—'রাজবন্দী দেশনেতাদের স্মরণ করুণ'—

—'আপনার কর্তব্য স্থির করুন'—

—'ডু অর ডাই'—

—'বন্দে মাতরম্'—

আরও আধ ঘণ্টা পরে ছয় সেলের একটা টর্চ আর জন পাঁচ-সাত

কনেষ্টবল্ নিয়ে বেরুলেন এম্‌দাদ হোসেন। কিন্তু কোনোখানে কারো চিহ্ন নেই। অন্ধকার সহরের পথে পথে যারা বজ্র-কণ্ঠে শ্লোগান তুলেছিল, অন্ধকারের মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

•কালো মেঘে মেঘে আকাশটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। দিগন্তে লাল তলোয়ারের ঝলক। অগ্নিময় কশার আঘাতে ঝড়ের ঘোড়াকে তাড়না করে আসছে বিপ্লবের রক্তদূত।

এদিকে ব্রীজের আড্ডা জমেছিল পূর্ণবাবুর বাইরের ঘরে। রাত জেগে খেলা চলছে, বেশ জমাট খেলা।

পূর্ণবাবু আছেন, তাঁর চির-প্রতিদ্বন্দ্বী কালীসদন আছেন, সারদা চক্রবর্তীর ছেলে বরদাবাবু আছেন, শিখ-মোটর-সার্ভিসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী গুরদিৎ সিংও আছে। গুরদিতের মুখে ঘন দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে বালা। এক হাতে উল্‌কীতে লেখা—সৎশ্রী আকাল। আড়ে বহরে আদর্শ পাঞ্জাবী। কিন্তু বাংলা দেশে পঁচিশ বছর থেকে এবং নিশ্চিন্ত-নগরের নিশ্চিন্ত আবহাওয়ার জারকে জীর্ণ হয়ে সে প্রায় বাঙালী হয়ে গিয়েছে। আঠারো মাইল দূরের রেল-ষ্টেশন থেকে মেল-ট্রেনের যাত্রীদের নিশ্চিন্তনগরে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সে অন্যতম কাণ্ডারী।

পূর্ণবাবু আর গুরদিৎ পার্টনার—অন্য দিকে বরদাবাবু আর কালীসদন। গুরদিঃ ভালো খেলতে পারে না, কিন্তু খেলার প্রতি তার একটা অসাধারণ মোহ আছে, আর আছে বাঙালীর সঙ্গে মিশবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা। অদ্ভুত ভালো মেজাজের লোক গুরদিৎ। কখনো চটে না, প্রায়ই হাসে—হো হো করে হাসে এবং দু'মাইল দূর থেকে সে হাসির শব্দ শোনা যায়।

এমনিতে গুরদিৎ পুণ্যাত্মা লোক—এই ছোট মফঃস্বল শহরেও সে একটা ছোট গুরুদ্বার আর শিখ ধর্মশালার বন্দোবস্ত করেছে।

পূর্ণোৎসাহে তাস খেলা চলছিল।

গুরদিৎ খুশি হয়ে বললে, এই দিলাম রুইতনের টেক্কা—

আর রুইতনের টেক্কা! কালীসদন বললেন, এই করলাম রঙের তুরুপ—

—ছিঃ ছিঃ, করলে কী সিংজী! ক্ষোভে এবং ক্রোধে পূর্ণবাবু হাতের তাসগুলো মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন: দিলে তো খেলাটা ডুবিয়ে!

—কেন, টেক্কার পিট নেবোনা?

—টেক্কার পিট নেবে, তার আগে তেরোখানা রঙের হিসাব তো নিতে হয়! টেক্কা তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছিল না, পরে নিলেই হত। গেল ডাউন হয়ে!

—তাইতো—তাইতো—!—সিংজী অপ্রতিভ হয়ে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গুলো চুলকোতে লাগল:

—আমি ভেবেছিলাম—

—নাঃ—অসম্ভব। তোমাকে পার্টনার নিয়ে বসাই ভুল হয়েছে। এত ভালো তাস হাতে, অথচ খেলাটা ডুবে গেল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

সিংজী ম্লান হয়ে রইল। বললে, আচ্ছা, আর ভুল হবে না।

পূর্ণবাবু অনাসক্ত বৈরাগীর মতো একটা হরতনের পাঞ্জা ফেলে বললেন, আর কী হবে। চারটের খেলা সিওর, অথচ তিনটে ডাউন দিতে হল।

এক কোণে রমাপদবাবু একখানা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে কী যেন পড়ছিলেন। অন্-প্রিন্সিপল্ তিনি কখনো তাস খেলেন না। তিনি নি

শিক্ষাব্রতী—অতএব তাঁকে সব দিক থেকে আদর্শ চরিত্রের হতে হবে—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। সেই জন্যে রমাপদবাবু বিড়ি-সিগারেটকে বিষতুল্য মনে করেন, মাথায় দশ-আনি ছ-আনি ছাঁট দেন না; উপন্যাস পড়েন না, সিনেমা দেখেন না এবং চেষ্টারফিল্ডের পত্রগুচ্ছ আর কার্লাইলের প্রবন্ধ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন।

রামপদবাবু বললেন, তাস খেলা নিয়ে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন পূর্ণবাবু? এতেই যদি এত মেজাজ খারাপ করতে হয়, তা হলে কোর্টে গিয়ে মাথা ঠিক রাখেন কেমন করে? তাই চেষ্টারফিল্ড বলেছেন—

—না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না—

হঠাৎ বাইরে তীব্র ধ্বনি উঠল:

—'বন্দে মাতরম্'—

—'ডু অর ডাই'—

কী ব্যাপার? এক সঙ্গে চমকে উঠল সকলে।

—'বন্দী নেতাদের স্মরণ করুণ'—

সাইকেলের গতির সঙ্গে দূরে চোঙ্গার কম্বুনাদ মিলিয়ে গেল।

কালীসদন বললেন, জানেন না? সমস্ত ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে। বোম্বাইতে—আহমেদাবাদে ভয়ানক কাণ্ড চলেছে। হ্যাট পোড়ানো হচ্ছে, ষ্টেশন, ট্রাম জ্বালানো হচ্ছে—সাংঘাতিক কাণ্ড সুরু হয়েছে দেশে।

গুরদিৎ বললে,—তাই নাকি? আর পাঞ্জাবে?

—হ্যাঁ—লাহোরেও হয়েছে।

—ঠিক আছে—সিংজীর মুখ উল্লাসে জ্বলে উঠল: আমার পাঞ্জাব কখনো পিছিয়ে থাকবে না। রাউলাটের হামলা আমার দেশের উপর

দিয়েই সব চাইতে বেশি হয়ে গেছে। কামানের সামনে বাচ্চা-জেনানা বুক পেতে দিয়ে তাজা খুনে মাটি রাঙিয়ে দিয়েছে আমার পাঞ্জাব—রণজিৎ সিং—গুরুজীকা পাঞ্জাব!

সিংজীর ভারী গম্ভীর কথার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল—সমস্ত ঘরটা যেন গমগম করে উঠল একসঙ্গে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সকলে তার মুখের দিকে তাকালো। সেই সদা-হাস্য স্থূলবুদ্ধি সিংজী এ নয়। এর শিরায় শিরায় যেন দোলা দিয়েছে বিদ্রোহী পাঞ্জাবের রক্ত—'ওয়া গুরুজীকা ফতে' মন্ত্রে যারা মুহূর্তে অনায়সে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারত—এ তাদেরই বংশধর।

কিন্তু কালীসদন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

—তাই বলে এখানেও এসব আরম্ভ করবে নাকি ওরা?

পূর্ণবাবু বললেন, আশ্চর্য নয়।

—সে কি! কোর্ট-কাছারী বন্ধ হয়ে যাবে! বলেন কি মশাই—আদালতের কাজকর্ম না থাকলে খাব কী!

পূর্ণবাবু ম্লান মুখে বললেন, তবে তো মুস্কিল!

রমাপদবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন? সব চাইতে আগে ষ্ট্রাইক হবে ইস্কুল। খাওয়া চলবে, পরা চলবে—দু'দিন পরে আপনাদের কাছারীও ঠিক নিয়মমতোই চলবে, কিন্তু ইস্কুলের দফা কত দিনের জন্যে গয়া—তার ঠিক নেই। যেন স্বাধীনতা পাওয়ার পথে একমাত্র শত্রু হচ্ছে শিক্ষা, আর যেন তেন প্রকারে ওই শত্রুটাকে নিপাত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

কালীসদন বললেন, ঠিক কথা! স্বাধীনতার জন্যে লড়াই হচ্ছে—সে বেশ জিনিস। স্বাধীনতা কে না চায়? কিন্তু তাই বলে আমাদের ঘাড়ের

ওপর কেন? কলকাতায় হচ্ছে হোক—বোম্বাইতে হচ্ছে হোক্—কিন্তু নিশ্চিন্ত-নগরে? কোর্ট বন্ধ করে, ইস্কুল বন্ধ করে? এ সব স্বাধীনতার অর্থ বুঝিনা মশায়।

সবাই চুপ করে রইল। কেবল যে লোকটি এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল সেই বিড়-বিড় করে কিছু একটা বললে, কিন্তু কেউ শুনতে পেলনা। বরদা অনেকটা স্বগতোক্তি করলে: সে বোঝাবার মতো মগজ তোমার নেই বাপ্।

—আর সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে হঠাৎ ছাদ-ফাটানো হাসি হেসে উঠল সিংজী। প্রকাণ্ড দেহটা দুলে উঠল—ঘন দাড়ির ফাঁকে প্রকাণ্ড মুখের বত্রিশটা দাঁত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটা অপরিসীম কৌতুকের উচ্ছ্বাসে।

—হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ। এ বড় চমৎকার কথা। আমরা কিছু করব না—চাকরী চলবে, ব্যবসা চলবে—আর কলকাতা বম্বাইতে লড়াই হয়ে স্বাধীনতা এসে যাবে। এমন মুফৎ স্বাধীনতা আসে না কালীবাবু। সবাইকেই দিতে হয়, সবাইকে কাজ করতে হয়। অনেক শিখের কলিজার রক্ত দিয়ে পাঞ্জাব বড় হয়েছিল—খবরের কাগজ পড়ে নয়।

সিংজী উঠে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা—আপনারা বসুন। ঢের রাত হয়ে গেছে, আমি এবার উঠলাম।

অন্ধকারের মধ্যে নেমে দ্রুত চলে গেল সিংজী। পাঞ্জাব উত্তাল—বোম্বাই উতরোল। ঘরের কোণে তাস খেলতে মনের কোণে কোথায় যেন বাধে। মুক্ত রক্ত—উন্মাদ পদাতিক আর অশ্বারোহী বাহিনীর বিজয় অভিযান এখনো শিখের মনে শুধু স্মৃতির স্বপ্নবিলাসই নয়; ইতিহাসের অরণ্য থেকে পাঞ্জাব-কেশরীর গর্জন স্নায়ুরন্ধ্রে মেঘমন্দ্ররবে ধ্বনিত হচ্ছে। সিপাহী-বিদ্রোহে যে রক্ত একবার মাতাল হয়ে

উঠেছিল, যে রক্ত বারে বারে নেচে উঠেছে নানা ঐতিহাসিক আবর্ত্তন-আলোড়নে—আজ তা কি আবার কোনো নতুন ছন্দে বন্যা বইয়ে দিতে চায়!

আর ঘরের মধ্যে পাশাপাশি চুপ করে রইলেন পূর্ণবাবু, রমাপদ বাবু, কালীসদন বাবু। খবরের কাগজ এক কথা—'কুইট ইণ্ডিয়া' নিয়ে পাবলিক লাইব্রেরীর বারান্দায় বাদ-বিতণ্ডা করাও এমন কিছু শক্ত কথা নয়। কিন্তু ঝড় কে চায়—নিজের জীবনে, নিজের ঘুমন্ত প্রশান্ত অবকাশকে কে চায় বিঘ্নিত করতে! স্বাধীনতা আসুক—সত্যাগ্রহ হোক—কিন্তু আমার ছেলেটি স্বদেশী না করলেই আমি খুসি হবো। তার ওপরে আমার কত আশা, কত ভরসা। যদি কোনোমতে 'ল'টা পাস করতে পারে, তা হলে আমার পসার নিয়েই তো বেশ জাঁকিয়ে বসতে পারবে। আর ব্যানার্জি সাহেবকেও বলা আছে: কোনো মতে থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিকটা তরে যেতে পারলে সিভিল কোর্টে একটা চাকরী নির্ঘাৎ। তাইতো বলি বাপু, গরীবের ছেলের ও-সব ঘোড়া রোগে দরকার কী! স্বাধীনতা আসবে, নিশ্চয় আসবে। আমাদের গান্ধী আছেন, জহরলাল আছেন, সুভাষচন্দ্র আছেন;—কত সোনার টুকরো ছেলে আছে—যারা জেলে যাচ্ছে, লাঠি খাচ্ছে, দ্বীপান্তরে চালান হচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলছে। কিন্তু তা দিয়ে তোমার কী! তুমি চাকরী-বাকরী করো, দু'টো পয়সা এনে বাপ-মাকে দাও, বিয়ে-থা করো, নাতি-নাতনী হোক, দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করে যাই। মেয়েটা বাড়িতে বসে রেকর্ড থেকে 'বন্দে মাতরম' শেখে শিখুক, কিন্তু খবর্দার কখনো যদি দেখি যে রাস্তায় মিছিলে নেমে 'বন্দে মাতরম' বলে চীৎকার করেছে, সেই দিনই কিন্তু ইস্কুল ছাড়িয়ে দেব—এই তোমাকে বলে

রাখলাম গিন্নী। বাপ-মাকে মেরে ও-সব স্বদেশী-ফদেশী করা চলবে না।

সহরের রাস্তায় এমদাদ হোসেন তখনো ছয় সেলের টর্চ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কনেষ্টবলদের পাঠিয়ে দিয়েছেন চার দিকে। রাস্তায় রাস্তায় চোঙ্গা ফুঁকে যারা নিশ্চিন্ত-নগরের নিশ্চিন্ত বিশ্রামকে বিড়ম্বিত করে তুলেছিল, তারা কোন্ দিকে গেল, পালালো কোন্ পথে ?

এমদাদ হোসেনের মুখের ওপরে অন্ধকার ঘনালো। লক্ষণ ভালো নয়।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার আদিত্য বললে, কী মনে হচ্ছে স্যার ?

—ট্রাবল্ অনিবার্য। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ আদিত্য ?

—বলুন।

—যারা সাইকেলে করে টহল দিচ্ছিল, অন্ধকারে তাদের তো চিনতে পারলাম না। কিন্তু একজনের গলার স্বর আমার অত্যন্ত চেনা বলে মনে হল।

—কার ?

—প্রমোদের।

—প্রমোদ ! আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে ঃ বিনোদ বাবুর ছেলে !

—নিঃসন্দেহ। চলো তো একবার দেখে আসি।

বিনোদ বাবু নিজের ঘরে বসে জাজমেণ্ট লিখছিলেন। এমদাদ হোসেনের ডাকাডাকিতে নেমে এলেন নীচে। বললেন, কী ব্যাপার, এমন অসময়ে হৈ-চৈ কেন ?

—আপনার ছেলে কোথায় ? প্রমোদ।

—অ্যাঁ।—বিনোদ বাবুর বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল ঃ কেন, পড়ছে।

—না, পড়ছেনা। তার ঘর অন্ধকার।

—সে কি, গেল কোথায়? বিনোদ বাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

—এত রাত্রে ছেলে কোথায় বেরিয়ে যায় সেটা তো বাপেরই জানবার কথা সকলের আগে—এমদাদ হোসেনের মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠতে লাগল।

—অাঁ—অাঁ—দাঁড়ান দেখি—অন্দরের দিকে পা বাড়াবার উপক্রম করলেন বিনোদ বাবু।

—মিথ্যে খুঁজছেন মিষ্টার চক্রবর্তী—এমদাদ হোসেন যেন তীব্রস্বরে ধমক দিলেন একটা: আমরা জানি সে কোথায়। দেশ-মাতাকে স্বাধীন করবার প্ল্যান নিয়ে কোথায় রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলেন মিষ্টার চক্রবর্তী। অথচ এবারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার ফার্স্ট নমিনেশন পেপার গিয়েছিলো আপনারই।

কিন্তু বিনোদ বাবু কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীটা হঠাৎ যেন সৃষ্টির আদিম রূপে ফিরে গিয়েছে—আকারহীন অবয়বহীন পেঁজা তুলার মতো খানিকটা রক্তবর্ণ গাঢ় ফেনার মতো দিগ্-দিগন্ত গাঁজিয়ে উঠেছে। শুধু কাণের কাছে একটা অস্ফুট শব্দ বাজছে: বিজ্-বিজ্-বিজ্। টগ্‌বগ্ করে কোথায় যেন শব্দ করে কী ফুটছে: রক্ত না আল্‌কাতরা?

এমদাদ হোসেন সভয়ে বললেন: এ কি—মিষ্টার চক্রবর্তী! দেখুন, বাড়ির সবাই দয়া করে একবার বাইরে বেরিয়ে আসুন তো। আদিত্য, দৌড়ে যাও, জল আনো খানিকটা। কী দুর্ভোগ! হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাখা চাই। একখানায় কুলুবেনা—দু'খানা।

প্রমোদ সত্যিই ঘরে ছিল না।

নিশ্চিন্ত-নগরের সীমা ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলেছে তারা। এ পথ পীচ-ঢালা মোটরের রাস্তা নয়। রেল-ষ্টেশন থেকে যে পথ দিয়ে মসৃণ স্বচ্ছন্দ গতিতে আসে মোটর, আসে সভ্য আর মার্জিত মানুষ; আসে খবরের কাগজ আর ডাকের ব্যাগ, দিল্লী-বোম্বাই-কোলকাতার যাত্রী আর রয়টার-গ্লোব-এ-পি-ইউ-পি মারফৎ বিশাল মহা-পৃথিবীর বার্তা—আজ আর সে পথে ওরা চলছেনা। ওরা চলেছে সেইখান দিয়ে—যেখানে মোটর এক পা এগুতে গেলে কর্ণের রথচক্রের মতো মেদিনী তাকে গ্রাস করবে। যেখানে পথের ধারে বড় বড় বাড়ি নেই, রেডিয়োর তার নেই, টেলিগ্রাফের পোস্‌ট্‌ নেই। যেখানে মাঝে মাঝে ভাঙা ঘর, অসংলগ্ন বস্তি। ডিস্‌ট্রিক্ট-বোর্ডের চিরন্তন এবড়ো-খেবড়ো পথ—ধূলো উড়ছে রাশি রাশি—হাঁ করে আছে পঙ্ককুণ্ড। রাঙা-মাটির টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তালের শ্রেণী—ডানা মুড়ে ঘুমিয়ে আছে শকুন, কখনো বা আকাশে এরোপ্লেনের রক্তচক্ষু দেখে পাখার ঝাপট দিয়ে জেগে উঠছে। অন্ধকার গড়িয়ে চলেছে চারদিকে। প্রসারিত ধান-খেতের মাথার ওপরে অনির্বাণ নক্ষত্র-বাসর। শেয়ালের ডাক—ঝিঁঝিঁর একতান—কাঠ-ব্যাং আর কোলা-ব্যাংয়ের সম্মিলিত কোলাহল। ভাদ্রের ভরা-নদী ঝপাস্‌ ঝপাস্‌ করে পাড়ি ভাঙছে, কাশবনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো সাপেরা সে শব্দে একবার নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

নদী পার হয়ে চারটে সাইকেল চলেছে। এত ধূলো—এত অসমতল, পদে পদে বাধা পাচ্ছে সাইকেলের স্বচ্ছন্দ গতি। ব্রজেন নেমে পড়ল।

—কী হল ব্রজেন দা?

—চেন খুলে গেল।

—তাড়াতাড়ি করে নাও—ওরা হয়তো কখন থেকে মাঠের মধ্যে এসে বসে আছে।

—এই এক মিনিট।

তিন চারটে টর্চের আলোয় চেনটা ঠিক হয়ে গেল। আবার যাত্রা। নিঃশব্দ—নিবাক্। শুধু সাইকেলের শব্দমুখর চাকার নীচে ধূলোয় ভরা পথটা অতি কষ্টে পেছনে সরে যাচ্ছে। পথের ধারে নয়ানজুলিতে ব্যাংয়ের ডাক— ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েই আবার দ্বিগুণ বেগে মুখর হয়ে উঠছে।

—ভাতারমারীর মাঠ আর কত দূর?

—আরো মাইল খানেক।

—সেইখানেই ওরা জমায়েৎ হবে তো?

—সেই রকমই তো কথা আছে। তাড়াতাড়ি চলো ভাই।

—তাড়াতাড়ি তো চলতে চাই। কিন্তু যা ধূলো!

অন্ধকারে ব্রজেনদা মিষ্টি করে হাসল: সহরের ছেলে, ধূলোয় তো কখনো পা দাও না। আমাদের মতো চাষাদের সঙ্গে মিশলে দু'দিনেই ধূলোর মধ্যে সাইকেল চলা শিখতে পারবে নিশ্চয়।

এক জোড়া কিশোর চোখ দপ্ দপ্ করে উঠল। সাইকেলে জোর প্যাড্‌ল্ করতে করতে সে সুর ধরলে:

'ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা ঘুচাবো তিমির-রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল—'

—সাবাস্ ভাই, সাবাস।

তাল গাছ, ধানের ক্ষেত—ঘুমন্ত গ্রাম আর মৃত্যুমগ্ন বাংলা দেশকে পেছনে ফেলে সাইকেল এগিয়ে চলেছে। তারপর যখন ওদের চমক ভাঙল, তখন সামনে দেখা দিয়েছে কালো রাত্রির বুকে রহস্য-প্রসারিত আদি-অন্তহীন ভাতারমারীর মাঠ। হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে—কেঁপে উঠছে তালের পাতা, আর যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কোনো এক মৃত্যু-পথিকের অসহায় গোঙানি : মরে গেলাম রে বউ, পানী দে, এক ফোঁটা পানী দে আমাকে—

কিন্তু আজ শুধু একটি মানুষের নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত-প্রাণের কান্না উঠেছে ভাতারমারীর মাঠে। তাদের মুখের গ্রাস, তাদের তৃষ্ণার জল ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ হাত—রোমশ, কর্কশ—রক্ত-লোলুপ নখর-শোভিত কোটি কোটি হাত! যুদ্ধ ঘনিয়েছে—দুর্ভিক্ষ নেমে আসছে—প্রতিদিনের পীড়নে কশাইখানার পশুর মতো নির্বিকার অপ্রতিবাদে প্রাণের অর্ঘ্য ঢেলে চলেছে তারা। কিন্তু হিসাব-নিকাশের দিন আজ। ভাতারমারীর মাঠে শুধু মৃত্যুর কান্না নয়—নবযুগের নব-জাতকের জয়ধ্বনি!

রাত্রির বুক চিরে জ্বলছে পনেরো-বিশটা রক্তাক্ত মশাল। কত মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে? একশো, দুশো, তিনশো, চারশো? কোনো হিসেব নেই। এ ডাক স্পেশ্যাল-অফিসারের নয়—চৌকিদারের হাঁকে এরা দলে দলে যুদ্ধসংক্রান্ত বক্তৃতা শোনবার জন্যে এসে জড়ো হয়নি। এ আহ্বান ওরা শুনেছে নিজের সত্তার ভেতর থেকে—শুনেছে স্নায়ু-শিরার রক্ত-কল্লোলে। পনেরো-বিশটা মশালের আলোয়—এই জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে এই মানবগুলো যেন অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। রাজবংশী আর সাঁওতালের ভীতি-বিহ্বল মুখ—যারা পৃথিবীর মাটির সব চাইতে

অন্তরঙ্গ আত্মীয় অথচ পৃথিবীর কাছেই চিরকাল অপরাধী হয়ে আছে—তারা আজ কোন্ নতুন অধিকারে হঠাৎ আত্ম-চেতন হয়ে উঠল এমন ভাবে যে সে মুখে নির্ভীক নিঃসংশয়তার বজ্র-কঠোর রেখা পড়েছে এসে ?

চারটে সাইকেলের শব্দে মানুষগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। জনশূন্য তিমির-প্রান্তরে মশালের লাল আলোয় দুলতে লাগল কতগুলো দীর্ঘ ছায়া প্রেতচ্ছবির মতো। আর সকলের আগে এগিয়ে এল লালচাঁদ মণ্ডল।

—আপনারা এসেছেন বাবু ?

ব্রজেন বললে, হাঁ, এসে পড়েছি। তার পর, সব জমায়েত হয়েছ তোমরা ?

—দেখতেই পাচ্ছেন।—লালচাঁদ মশালের আলোয় ভয়ঙ্কর ভাবে হাসল ঃ যারা আসেনি—তাদের এখনি এনে দিচ্ছি। এই—নাগারা।

—ডুম্—কড়্‌ড়্‌-র্—

ভাতারমারীর মাঠে ডঙ্কা বাজল সাঁওতালদের। ডুম্—কড়্-র্-র্—আকাশের ভীতি-সংকীর্ণ বুক চিরে মন্দ্রিত হল রণবাদ্য। পায়ের তলায় যেন মাটি থর্-থর্ করতে লাগল, শিউরে উঠতে লাগল ধানের শীষ!

—কড়্-র্—র্—ক্র্যাং—

চারদিক থেকে প্রবল কল্লোল। জনসমুদ্রে জোয়ার। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে—গ্রাম ছাড়িয়ে—মাঠ পেরিয়ে। দূরে কাছে নাচছে রাশি রাশি মশাল। পৌণ্ড্রবর্ধনের সমাধিস্তূপ ভেঙে ছুটে আসছে গৌড়ীয় বাহিনী।

কিন্তু নিশ্চিন্তনগর অনেক দূর। এমদাদ হোসেন সেখান থেকে এই রণডঙ্কার করাল নির্ঘোষণ শুনতে পেলেননা।

—ছয়—

সকাল বেলা চা খেয়েই বেরুল এডিথ। কল দেখতে হবে। উকীল সারদা বাবুর একমাত্র মেয়ে, বড়লোকের দুলালী। প্রথম সন্তান-সম্ভবা বলে বাপের বাড়িতে এসে উঠেছে। ক'দিন থেকেই তার পেটে একটা যন্ত্রণা—অবশ্য অসময়ে।

এডিথ দেখে এল মেয়েটিকে। ফল্‌স পেইন। সমস্ত মনটা অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গিয়েছে। এই বড়লোকের মেয়েরা যে কী জাতীয় জীব সেটা সে এখনো বুঝে উঠতে পারল না। সাংসারিক কাজে কুটোটি ভেঙে দু'খানা করতে জানে না—তা বরং নাই জানল; কিন্তু এক-আধটু এক্‌সারসাইজ্‌ তো করা দরকার। কিন্তু সে সব কিছুই নয়, থলথলে খানিকটা মাংসপিণ্ড মাত্র। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বুক ধড়ফড় করে—এক ঘণ্টা বই পড়লে নাকি চোখে অন্ধকার দেখে। এই অপদার্থের দল পৃথিবীতে কী কারণে বাঁচে এবং অনাবশ্যক ভাবে খানিকটা অক্সিজেন আত্মসাৎ করে, সেটা অনুমান করা এডিথের সাধ্যায়ত্ত নয়। বীরপ্রসবিনীর জাতিই বটে! তাই প্রথম সন্তানটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আসে যমরাজের পরোয়ানা। যারা টিঁকে থাকে, সারা জীবন নানা ব্যাধির ভারে বিড়ম্বিত হয়, স্বামীকে আর সংসারকে বিব্রত করে তোলে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এডিথ আসছিল। ওই আহ্লাদী পুতুল মেয়েটা তার সমস্ত সকালকেই যেন অশুচি করে দিয়েছে। বলেছিল: একটু এক্‌সারসাইজ করতে পারেন না? ওতে খারাপ এফেক্‌ট হয়।

রোগিণী বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, ডাম্বেল-মুগুর করতে বলেন নাকি ?

—না, না, অত বীরত্বে কাজ নেই। একটু ফ্রী-হ্যাণ্ড—

—আচ্ছা দেখব—রোগিণী মস্ত একটা হাই তুলে বললে, দেখুন, শুয়ে থাকতেই আমার ভালো লাগে! ও-সব আমার ধাতে সইবে না।

—ধাতে সইবে না তো—একটা কটু গালাগালি এসেছিল এডিথের মুখে। কিন্তু এই অকালপক্ক একটা অপোগণ্ড মেয়ের সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে হল না। সামলে নিয়ে বললে, চেষ্টা করবেন। দিনরাত শুয়ে থাকলে ক্ষতি হবে আপনারই—

মেয়েটি অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিলে : হুঁ,—ওরে রামপিয়ারী, একটু হাওয়া দে—একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠলাম যে—

এডিথ আর কথা বাড়ায়নি। ভিজিটের টাকা ক'টা নিঃশব্দে ব্যাগে পুরে যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল, রোগিণীর স্পষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তার কানে এল : আরে রেখে দাও তোমাদের লেডী ডাক্তার। কলকাতায় অমন গণ্ডা গণ্ডা দেখে এলাম। উনি বলেছেন মেডিক্যাল্ কলেজে আমাকে নিয়ে গিয়ে—

এডিথ হেঁটে চলছিল। অপূর্ব সুন্দর দেহ-ভঙ্গিমার তালে তালে পায়ের জুতোটা বাজছিল খোয়া-ওঠা পথের ওপরে। কোনো দিকে না তাকিয়েও এডিথ টের পাচ্ছিল চারদিক থেকে অসংখ্য চোখ যেন আপাদ-মস্তক গিলে খাচ্ছে তার। নয়ন-বাণ কথাটা যদি সত্যি সত্যিই বাণরূপ পেত, তা হলে অনেকক্ষণ আগেই শরশয্যা রচিত হয়ে যেত তার।

একজন পথচারী যেতে যেতে তাকে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে গেল—

কে একজন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে শিস্ দিলে বেশ টানা দীর্ঘচ্ছন্দে। 'দি গ্র্যাণ্ড নিশ্চিন্ত-নগর র‍্যাস্তরাঁ' থেকে একজন দরদ-ভরা গলায় ভাটিয়ালী ধরলে :

"বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে মানের বেড়া,

হাত বাড়াইলে না পাই লাগাল

আমার এমনি কপাল পোড়া,

প্রাণ কোকিলা রে—"

ভরা ভাদ্র মাসে কোকিল ডাকে না—তা ছাড়া সকালের এমন চমৎকার রোদকে নিশিরাত বলে কল্পনা করবারও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই কোনো। সুতরাং ব্যাপারটা রূপক এবং বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ। কিন্তু এ পুরোনো ব্যাপার—নিত্য নৈমিত্তিক্ ; অভ্যাস হয়ে গেছে—তেমন করে আর গায়ে লাগে না।

হঠাৎ মনে পড়ল প্রভাসকে। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার আশা করেছিল—অথচ যাকে নিয়ে ঘর বাঁধা গেল না। ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো পৃথিবী। অপমানিতের পৃথিবী—লাঞ্ছিতের পৃথিবী। যেখানে মানুষ নাম-গোত্রহীন—যক্ষপুরীর তাল তাল সোনার দেশে শুধু সংখ্যা ; রাজর্ষি জনক আর বীরশ্রেষ্ঠ হলায়ুধের হলধারী যে বংশধরদের আজ রাজ্য নেই, আয়ুধ নেই—অন্নও নেই।

প্রভাস বললে, দুঃখ কোরোনা রেখা। আমি পারলাম না। আমার কাজের মধ্যে তোমাকে ডাক দিয়েছিলাম—দেখলাম সেখানেও তোমার মন সাড়া দিচ্ছে না। তাই আমিই চলে যাই।

হাতের মধ্যে থেকে মুখ না তুলেই রেখা বলেছিল,—যাও।

—তুমি কিছু ভেবোনা। ঘর বাঁধতে কি সবাই পারে? তা ছাড়া তুমি তো স্বাধীন—তোমার শিক্ষা আলাদা, সংস্কার আলাদা। তুমি পথ

চলতে জানো, পথ চলতে ভালোও বাসো। ঘরের গণ্ডী থেকে মুক্তি পেলে—এ ভালোই হল।

হায়রে ঘরের গণ্ডী—হায়রে মুক্তি! যে সব মেয়ে সত্যিকারের কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদের সহজাত নারীত্বের সংস্কারকে জয় করেছে, তাদের কথা এডিথ জানেনা। কিন্তু ওর নিজের দিক থেকে এবং আরো বারো-আনা মেয়ের তরফ থেকে একথা ও জোর করে বলতে পারে যে এমন অসহায় ভাবে এত বড় পৃথিবীতে ওরা চলতে চায় না। ইয়োরোপ বলো, আমেরিকা বলো—পৃথিবীর যে প্রান্তের কথাই বলো—মেয়েদের সঙ্গে সকলেরই যেন একটা নির্ভুল খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। যে স্বাধীনতা পুরুষের হাত দিয়ে মেয়েদের কাছে এসে পৌঁছেচে, তারই সুযোগ নিয়ে মেয়েদের চূড়ান্ত অসম্মান করে পুরুষেরাই। প্রভাস কেমন করে জানবে কত দুঃখে, কতখানি বাধ্য হয়ে পথে নামতে হয় আধুনিকাদের। ভুয়া সিভাল্‌রির মুখোস যখন-তখন খুলে যায়—বেরিয়ে আসে কুৎসিত লালসাতুর মুখ-বিকৃতি। প্রতি পদে অসম্মান—প্রতি পদে বাক্যবাণ সারা গায়ে এসে বিছুটির মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়। লজ্জায় মাথা মাটিতে নুয়ে যায়—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে।

আর সেই জন্যেই পথ চলতে হয় অত্যন্ত কঠিন হয়ে—অতিশয় রূঢ় হয়ে। একটু শৈথিল্যের পরিচয় দাও, খেয়াল-খুশিতে একটুখানি হেসে ওঠো—অমনি ট্রামগাড়িতে পাশের সীটে বসা তরুণটি কল্পনা করে নেবে তুমি তার প্রেমে পড়ে গেছো। আর পরবর্তী ইতিহাস তো জলের মতো সরল আর তরল।

কিন্তু এডিথের তত্ত্ব-চিন্তায় বাধা পড়ে গেল। সিনেমা-হাউসের

সামনে ছোট একফালি মাঠের মতো পড়ে আছে। চোখে পড়ল সেখানে অনেকগুলি মানুষ জমেছে। বেশির ভাগ স্কুলের ছাত্র—বেকারের দলও আছে কিছু। সভা হচ্ছে ওখানে। ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে—ধ্বনি উঠছে—'বন্দে মাতরম্'! রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে একদল কৌতূহলী দর্শক।

নিজের অজ্ঞাতেই এডিথ দাঁড়িয়ে গেল। কংগ্রেস বে-আইনি, সমস্ত সভা-সমিতির ওপরে নেমেছে একশো-চুয়াল্লিশের কঠোর অনু-শাসন। কোন্ ভরসায় এখানে এমন করে মিটিং জমিয়েছে ওরা?

হঠাৎ দূরে নারীকণ্ঠে ধ্বনি উঠল : বন্দে মাতরম্—

এবার সমস্ত লোকের দৃষ্টি ঘুরে গেল সেই দিকেই। মফঃস্বল সহরের খোয়া-ওঠা পাথর-বাঁধানো পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আর একটি শোভাযাত্রা। এ দলে পুরুষ নেই—সমস্ত মেয়ে এবং তার সব কয়টিই স্কুলের ছাত্রী। তাদের সকলের আগে আগে আসছে পূরবী। তার কাঁধে পতাকা।

—'বন্দী দেশনেতাদের স্মরণ করুন'—

—'আপনার কর্তব্য পালন করুন'—

কল্লোলিত জনতা আরো বেশী উতরোল হয়ে উঠল—হয়তো মেয়েদের দেখেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠল তারা।

—'বন্দী দেশনেতাদের স্মরণ করুন'—

—'মহাত্মা গান্ধী কি জয়'—

—'পণ্ডিত জহরলাল কি জয়'—

—'রাষ্ট্রপতি আজাদ কি জয়'—

—'বন্দে মাতরম্'—

পূরবী আসছে সকলের আগে আগে। তার পেছনে পেছনে সন্ধ্যা।

পূরবীর একনিষ্ঠ ভক্ত সে—তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলে সব সময়ে। কিন্তু পূরবীর বন্ধু অনিলা নেই—পূর্ণ বাবুর অর্ধাঙ্গিনীও নেই।

রাত্রে সেই প্যাম্ফলেট পড়ে হঠাৎ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে পূরবী। সত্যিই আর বসে থাকা চলে না। দেশের ডাক—গণ-দেবতার দাবী। এই নিশ্চিন্ত-নগরের মেয়েরা শুধু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারে, স্বপ্ন দেখতে পারে, পরচর্চায় জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর জীবনের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা—কোনো আদর্শই নেই ওদের কাছে। এই অসুস্থতার আত্ম-বিকার থেকে ওদের মুক্ত করার ভার নেবে কে—কে বোঝাবে শুধু বীরমাতা না হয়ে বীরাঙ্গনা হওয়ারও দরকার আছে।

পূরবী অনুমান করেছে সে ভার তারই—সে কথা বোঝাবার দায়িত্ব তারই। স্থির করেছে এই আন্দোলনে সে ঝাপিয়ে পড়বে—যোগ দেবে এই বে-আইনী সভায়। কিন্তু অনিলাকে সে রাজি করাতে পারেনি। অত উগ্রতা নেই অনিলার চরিত্রে। সে ওজন করে বোঝে, ওজন করে চলে—নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতটা প্রগাঢ় আস্থাও তার নেই। তা ছাড়া অনিলার সব সময়ে মনে রাখতে হয় ছোট ভাইটির কলেজে পড়বার মাইনেটা তাকেই চালাতে হবে, কারণ, অথর্ব বাপের একটি কাণা কড়িরও সঙ্গতি নেই। অনিলা বলেছে, মাপ করো পূরবীদি, আমি পারব না।

পুরবী ঘৃণা-কষায়িত দৃষ্টিতে বলেছে,—শেম্!

অনিলা লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিয়েছে ঃ কী করব বলো।

—কিছুই করতে পারবে না। শুধু একটা কাজ কোরো। ভালো দেখে একটা বিয়ে করে ফেলো চট্-পট্। যাতে অন্তিমে সতী-স্বর্গ লাভ এবং পুন্নাম নরকের হাত থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থাটা একসঙ্গেই হয়ে যায়।

অনিলা মাথা নীচু করে থাকা ছাড়া কিছু আর বলতে পারেনি।

পূরবী হঠাৎ ঝাঁঝালো সুরে বলেছে, ওই লেডী ডাক্তারটা আমাকে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসে! সরকারী চাকরী করে—ক্রীশ্চান—তাই ভালো ভালো উপদেশ দিতে বাধে না। কিন্তু কোনো দিন স্যাক্রিফাইস্ করেছে—ভেবেছে দেশের কথা?

অনিলার যেন চমক ভেঙেছে। পূরবীর এই আকস্মিক উদ্দীপনার পেছনে এডিথের কোনো প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা নেই তো?

আজ কাঁধে জাতীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসবার সময় সেই এডিথের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল পূরবীর। পূরবী কি তাকালো তীব্র দৃষ্টিতে—খানিকটা অনুকম্পার ভঙ্গিতে? অথবা এডিথকে সে দেখতেই পেলো না?

—'বন্দে মাতরম্'—

অসংখ্য মানুষের কোলাহলের মাঝমানে পূরবী উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে একটা টেবিলের ওপর—যাতে সকলে ছোট-খাটো মানুষটিকে ভালো করে দেখতে পায়। বহু লোকের মাঝখানে, সম্মিলিত জনতার ভেতরে তাকে দেখাচ্ছে রাজেন্দ্রাণীর মতো। তার মুখে সূর্যের আলো পড়েছে, তার সোনার ফ্রেমের চশমা জ্বলছে—হাওয়ায় উড়ছে তার চূর্ণ-কুন্তল, তার শাড়ীর পাড়। অনিলা থাকলে বলতে পারত—হাঁ, পূরবীব জিত হয়েছে, আজ আর এডিথ তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, কোনোখানেই না।

—'গান্ধী মহারাজ কি জয়'—

ভৈরব জয়ধ্বনি। পূরবী বক্তৃতা দিচ্ছে।

—বন্ধুগণ, আজ কী জন্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আপনারা জানেন। বৈদেশিক শাসন-তন্ত্র আজ প্রতি পদে পদে—

ক্লিক্। এডিথের পাশেই একটা শব্দ। ক্যামেরাতে কে যেন ছবি নিচ্ছে পূরবীর।

কিন্তু ওদিকে আবার কোলাহল। ভিড় ঠেলে লাল-পাগড়ি এগিয়ে আসছে। সামনে ইউনিফর্ম-পরা ইন্‌স্পেক্টর, দারোগা। জনতার কতক আস্তে আস্তে সরে গেল, কতক আরো ঘন হয়ে এগিয়ে এল।

—'বন্দে মাতরম্'—

পূরবীর চোখ জ্বলছে।—বন্ধুগণ, স্মরণ রাখবেন, এ ইতিহাস এক দিনের নয়। পলাশীতে যে পাপ আমরা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত—

সভার মধ্যে ভেঙে পড়েছে লাল পাগড়ি। বিপ্লবের আর দেরী নেই—পূরবীর পরিণতি সম্বন্ধেও সংশয় নেই কারো। এডিথ আস্তে আস্তে সরে এল।

পিছনে প্রবল কোলাহল। হঠাৎ মানুষ ছুটতে সুরু করেছে চারদিকে। সভায় লাঠি-চার্জ হচ্ছে বোধ হয়।

* * *

একবেলার মধ্যেই নিশ্চিন্ত-নগরের রূপ বদলে গেল।

নিশ্চিন্তনগর আর নিশ্চিন্ত নয়। সমস্ত সহরটা যেন থম্ থম্ করছে। মীটিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে, ব্যাপকভাবে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে সভার সমস্ত উদ্যোক্তাদের। তাদের দলে আছে পূরবী, আছে সন্ধ্যা, আছে বরদা, এমন কি পোষ্টাপিসের কেরাণী সুধীর পর্যন্ত আছে। কাল পর্যন্ত যারা ছিল সাধারণ মানুষ—সহজ আর স্বাভাবিক, তোমার আমার মতো দশ জনের সঙ্গে মিশত, হাসত, কথা বলত, গল্প করত তারা যেন অসাধারণ হয়ে গেছে কার যাদু-মন্ত্রে। পুলিশের পাহারাতে তারা চলেছে

মফঃস্বল সহরের জেলখানাতে। তাদের মুখের দিকে কেউ তাকাতে পারছে না। স্কুল-মিস্‌ট্রেস্ পূরবী, নিশ্চিন্তনগরের বহু ছেলের মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া আধুনিকা সন্ধ্যা। পোষ্টাপিসের ল্যালাক্ষ্যাপা কেরাণী সুধীর আর সারদা বাবুর বি-এ ফেল ভাই চুপচাপ মানুষ বরদা—কে ওদের এক-সঙ্গে এমন ভাবে জড়ো করে দিলে—কে ওদের এমন করে নামিয়ে আনলে একটা নিশ্চিত আদর্শের সম-পংক্তিতে ?

তা ছাড়া আরো কিছু চাঞ্চল্যকর খবর আছে। পুলিশ সার্চ করে বেড়াচ্ছে শহরের বাড়ি-ঘর। কয়েকটি আপত্তিকর ছেলের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকতর কিছু একটা দুষ্কৃতি ঘটাবার জন্যে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও। তাদের মধ্যে আছে ব্রজেন, এবং সব চাইতে যেটা রোমাঞ্চকর খবর, তাদের মধ্যে আছে প্রমোদও—সার্কেল-অফিসার বিনোদ বাবুর গোবেচারী ভালো ছেলেটি।

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন রমাপদ বাবু। তাঁর চোখ ফেটে জল নয়—যেন রক্ত বেরিয়ে আসছে। শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার এই কাজ—এই করে বসল সন্ধ্যা। ধনে-প্রাণে তাঁকে অথৈ দরিয়ার মধ্যে যেন ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

রমাপদ বাবুর মুখে কথা নেই। খবরের-কাগজটা অবধি পায়ের কাছে বিমর্ষ হয়ে পড়ে আছে। এক বেলার মধ্যে যেন পঁচিশ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছে তাঁর।

গালে হাত দিয়ে বসে আছন পূর্ণবাবু। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ছাতের কার্ণিশে গোটাকতক চলিষ্ণু টিকটিকি, উড়ন্ত কাঁচপোকা আর পলায়মান মাকড়সার গতিভঙ্গি লক্ষ্য করছেন কালীসদন বাবু; যেন মর্ত্ত্যের পৃথিবীটা তাঁকে একান্তভাবে হতাশ করেছে, তাই কীট-পতঙ্গের

জগৎ থেকে একটা মানসিক সান্ত্বনা সঞ্চয় করবার চেষ্টায় আছেন তিনি। তবু পূর্ণবাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

—দেখা করেছিলেন ?

রমাপদ বাবু নীরব, নিশ্চল—যেন দারুভূত মুরারি।

—দেখা করেছিলেন মাস্টার মশাই ?

—অ্যা—? হাঁ।—

কী বললে ?

—কিছুই না।

—বণ্ড্ দিতে রাজী হল ?

—বণ্ড ?—এতক্ষণে রমাপদ বাবু বিদীর্ণ হয়ে পড়লেন : হুঁঃ, রাজী হবে! তা হলে পাকাপাকি ভাবে আমার সর্বনাশ করবে কেমন করে। উঃ, বোন নয়তো কালসাপিনী। দুধ-কলা দিয়ে পুষে বিষই বাড়িয়েছি! উত্তেজনায় রমাপদ বাবুর মুখ দিয়ে আর ক্লাসিক বেরুল না, বাকিটা যা বেরুল তা নিছক গালাগালি এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে।

—একেবারে কিছুই বললে না ?

—বলবে না ?—স্কুল থেকে কোনো ছেলেকে রাসটিকেট করবার সময় যেমনধারা হুঙ্কার ছাড়তে হয়, ঠিক তেমনি করেই একটা ব্যাঘ্র-গর্জন ছাড়লেন রমাপদ বাবু : তা হলে এতকাল কলেজে পড়েছে কি করতে, আরএতবার আই-এ ফেলই বা করল কেমন করে। বললে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্যে কারা-বরণ করেছি—দাসখৎ লিখে দেওয়ার অপমানকে মেনে নিতে পারব না।

—হুঁ।—পূর্ণবাবু চিন্তিত মুখে বললেন : কথাটা তো সন্ধ্যার নয়। হার মিস্ট্রেসের ভয়েস্ যেন শোনা যাচ্ছে এর ভেতরে।

—তাতে আর সন্দেহ আছে। রমাপদ বাবু বললেন, ওই পূরবী দাশগুপ্ত। সেই মেয়েটাই সন্ধ্যার মাথা খেয়েছে। কিন্তু বলুন তো এখন আমি কী করি? গবর্মেণ্ট-এইডেড্ ইস্কুল—এবার চাকরীটা নির্ঘাৎ যাবে। তার পর সপরিবারে উপোস করে মরতে হবে যুদ্ধের বাজারে।

পূর্ণবাবু জিভে-তালুতে সহানুভূতির শব্দ করে বললেন: চুক্-চুক্-চুক্। মনে মনে ভাবলেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে কষে ধমকে দিতে হবে অমলাকে। হালে একটা চরকা কিনেছে আবার। দিন রাত ঘটর-ঘটর করে ঘোরায়—ওটাকে আগে উনুনে দিয়ে তবে অন্য কথা।

কালীসদন বাবুর হঠাৎ যেন চমক ভাঙল।

—নাঃ, আমার মেয়েটাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবো। ওদের পাল্লায় পড়ে মেয়েটা একেবারে গোল্লায় যাবে বোধ হচ্ছে।

রমাপদ বাবু বললেন, তাই করুন মশাই, তাই করুন। বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার তো যা হ'ল! বাইরের আলো-বাতাসে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে ওদের কানায়ে ঠেলতে জুড়ে দেওয়াই ভালো।

পূর্ণবাবু সনিশ্বাসে বললেন, এখন দেখছি হিটলারের থিয়োরীই দরকারী। ব্যাক টু দি কিচেন অ্যাণ্ড কন্‌ফাইন্‌মেণ্ট—সংসারে শৃঙ্খলা আসুক, প্রজাপতির অনুগ্রহে বংশবৃদ্ধি হয়ে চলুক।

কালীসদন আবার টিকটিকিগুলোর দিকে মনোনিবেশ করে মন্তব্য করলেন: সর্দা-আইনে বাধে, নইলে ন'বছরে গৌরীদান করেই নিশ্চিন্ত হতুম। আর শুধু মেয়েই বা বলি কেন—ছেলেদের ব্যাভারও সুবিধে নয়। এই দেখুন না আমাদের সার্কেল-অফিসার সায়েবের অবস্থা! প্রমোদ তো চম্পট—এখন ব্লাড-প্রেসারে ভদ্রলোক যান-যান অবস্থা।

—নাঃ মশাই, বড় দুঃসময় পড়েছে।—পূর্ণ বাবু হতাশ হয়ে হাল

ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে : 'কুইট ইণ্ডিয়া' দূরের কথা, এখন যে ছেলে মেয়ে কুইট্ করছে, তার কী করি। আমার গিন্নী যদি এই চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ শহীদ হওয়ার জন্যে ফ্ল্যাগ নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন, তা হলে এণ্ডি-গেণ্ডি ছানা-পোনা নিয়ে আমি তো বেঘোরে মারা গেলাম!

রমাপদ বাবু কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস এসে তখন তাঁর দু'চোখ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। চাকরীটা এবারে গেল—ভারতরক্ষা-বিধানের একটি প্যাঁচও যে সঙ্গে সঙ্গে গলায় এসে এঁটে বসতে পারে এটাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। উঃ সন্ধ্যা! সন্ধ্যা শেষে এই করলে!

—ড্রম্—কড়্র—কড়্র—

সমস্ত নিশ্চিন্তনগরের অস্থিপঞ্জরে কাঁপন জাগিয়ে বাইরে থেকে উঠল নির্ঘোষ। যে ডঙ্কা কাল মুখরিত হয়ে উঠেছিল ভাতারমারীর মাঠে —আজ তারি নিনাদ উঠেছে মহকুমা-সহর নিশ্চিন্তনগরে।

—কড়র্-ক্র্যাং—

সহরের পথ-ঘাট শিউরে উঠল। তার সঙ্গে মানুষের কোলাহল। এক জন নয়—দু'জন নয়—চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের।

—'বন্দে মাতরম্'—

—'মহাত্মা গান্ধীকি জয়'—

—'চাল চাই—কাপড় চাই'—

—'স্বাধীন ভারত কি জয়'—

শুধু পূর্ণ বাবু, কালীসদন বাবু, রমাপদ বাবুই নয়। যেন হঠাৎ দিবা-নিদ্রা ভেঙে নিশ্চিন্তনগরের মানুষগুলো দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

চোখের সামনে যা তারা দেখতে পেল সেটা বিশ্বাস করবার মতো নয়। দেশে কি রাতারাতি স্বরাজ হয়ে গেছে, এত বড় শাসনতন্ত্র চিরদিনের মতো গেছে নীরব আর নিশ্চল হয়ে!

এমন দৃশ্য কেউ আর কখনো দেখেনি। কিছু দেখেছিল তিরিশ সালের সত্যাগ্রহে, কিন্তু এর তুলনায় সে কিছুই নয়। সে যদি প্রাণস্রোত হয়—এ প্রাণ-সমুদ্র। যে যুগে মরা, ঘুণে-ধরা বাঙলাদেশ এমন করে সামগ্রিকরূপে জেগে উঠত, তা বহুকাল আগেই বিস্মরণের তমসা গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কত মানুষ এগিয়ে আসছে? পাঁচশো, ছয়শো, সাতশো, হাজার? সে সংখ্যা অনুমান করবার ক্ষমতাও কারো নেই—চোখের দৃষ্টি যেন তাদের অন্ধকার করে দিয়েছে এই কল্পনাতীত লোকযাত্রা। খালি গা, নেংটি পরা—ধুলো মাখা, হাজারে হাজারে মানুষ। এই মহকুমা সহরের প্রান্ত দিয়ে ধুলোয় ভরা যে মেঠো পথটাকে একদিন সবাই ভুলে থাকত—সেই পথ দিয়ে এই প্রচণ্ড ভয়ানক জোয়ার এল কী করে?

হাজার হাজার হাতে হাঁসুয়া জ্বলছে—হাজার তেলের বাঁক আর তেলপাকানো লাঠি জ্বলছে—হাজার হাজার চোখ জ্বলছে, আর বাজছে তিরিশ-চল্লিশটা নাগাড়া। নতুন যুগের নতুন রণযাত্রা।

তাদের আগে আগে পতাকা বয়ে চলেছে প্রমোদ, ব্রজেন, সহরের আরো দু' তিনটি ছেলে। এতদিন যারা শিকার ছিল, আজ তারাই শিকারী; ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আজকের বন্দী আগামী কালের সেনানায়ক।

সমস্ত নিশ্চিন্তনগর বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ মেলে দেখতে লাগল। সত্যিই কি স্বরাজ এল দেশে? এই পাঁচ হাজার লোকের তরঙ্গকে

বাধা দেবে—নিশ্চিন্তনগরে এমন শক্তি কার আছে? শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যাদের—তাদের কোথাও দেখা গেল না।—আপাতত তারাই শান্তিমগ্ন।

প্রথমেই একদল এসে ঘেরাও করলে শিখ-মোটর-সার্ভিসের অফিস। পেট্রোল চাই।

দোতলায় দাঁড়িয়েছিল গুরদিৎ সিং। নীরব দৃষ্টি মেলে সে সমস্ত দেখছিল। ছুটতে ছুটতে ওপরে এল হরনাম সিং: মালিক, সব তেল যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওরা।

গুরদিৎ বললে, নিতে দাও।

—সে কি মালিক! লুট করে নিয়ে যাবে! বন্দুকটা বার করুন—গুলি চালান।

গুরদিতের রক্তে তখন কল্লোল জেগেছে। শুধু পাঞ্জাব নয়—শুধু চিলিয়ানওয়ালা নয়—শুধু জালিয়ানওয়ালা নয়। বাংলা দেশেও তা হলে মানুষ আছে! সাবাস ভাই সব, বহুৎ সাবাস!

হরনাম কাতর কণ্ঠে বললে, মালিক!

গুরদিৎ ধমক দিয়ে বললে, চুপ! শিখের বাচ্চা না তুমি? গুলি চালাবে কার ওপরে! যাও—ঘরে যাও।

দশ-পনেরো-বিশ টিন পেট্রোল যা পাওয়া গেল সব টানাটানি করে বার করে নিলে ওরা। তারপর পেট্রোল তার কাজ করলে। অফিস, আদালত—মদের দোকান। নিশ্চিন্ত-নগরের মাথার ওপর আগুন আর ধোঁয়া উঠতে লাগল কুণ্ডলী পাকিয়ে—আর দূর থেকে নির্নিমেষ চোখে তা দেখতে লাগল রঙীর ঘাটোয়াল কাণা-ঠাকুর। ভাতারমারীর মাঠের আশপাশ থেকে গ্রাম্যবধূরা উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে

রইল জলন্ত সহরের আভাসিত দিগন্তের দিকে—তাদের চোখের ওপর সূর্যালোক প্রতিফলিত হতে লাগল।

আর পাগলের মতো সহরময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন এমদাদ হোসেন।

থানার দারোগা কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। দরজায় উন্মত্ত করাঘাত। স্পন্দিত বুকে এবং বিবর্ণ মুখে দরজা খুললেন দারোগা।

—কী মশাই, কী খবর?

হাঁপাতে হাঁপাতে এমদাদ হোসেন বললেন, করছেন কী! শহর জ্বালিয়ে দিলে যে!

—কী করতে বলেন!

—ফায়ার করুন—লেভেল করে দিন সব! এ কি অরাজক পুরী নাকি! ইংরেজ-রাজত্ব কি শেষ হয়ে গেছে!

—পাগল হয়েছেন আপনি?—দারোগা বললেন ক'টা বন্দুক আছে থানায়, ক'জন লোককে গুলি করা যাবে? আর তার ফলটা কী দাঁড়াবে বুঝতে পারছেন না? আপনাকে আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে পাঁচ হাজার লোক। এস-ডি-ও এই কথাই বলেছেন।

—কী সর্বনাশ!

দারোগা বললেন, আপনি ভাববেন না মিষ্টার হোসেন। এ ইংরেজ রাজত্বই বটে। 'লায়ন হ্যাজ্ উইংস' শুধু নয়—নখ-দন্তও প্রচুর। একটা দিন ওদের রাজত্ব করতে দিন। কালই সহর থেকে আসবে ফোর্স—রাইফেলের গুঁতোয় সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

সহরের বুকে তাণ্ডব চলেছে। আগুন, ধোঁয়া আর কোলাহলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সব। থেকে থেকে হুঙ্কার উঠছে আকাশ-বাতাস-মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে। এমদাদ হোসেন ছুটে চললেন টেলিগ্রাম করতে।

কিন্তু সহর সে টেলিগ্রাম রিসিভ করতে পারল না—তার কাটা গিয়েছে। এমদাদ হোসন ধুলোর উপরেই বসে পড়লেন। বিনোদ বাবুর সঙ্গে তাঁর অবস্থার কোন তফাৎ নেই—চোখের সামনে সব কিছু অগ্নিকুণ্ডে রূপায়িত হয়েছে।

নিশ্চিত-নগরের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে নাগাড়া বাজতে লাগল: ডুম্—কড়্‌র—কড়র্—

সন্ধ্যার পরে ম্লান চাঁদ উঠেছে। কাণা-ঠাকুর ভীতি-মলিন মুখে মাচাংয়ে বসেছিল। শব্দ উঠল: ঝপ্-ঝপ্-ঝপাস্—

পাঁচ হাজার লোক সহর থেকে ফিরে এসেছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীতে—ভরা ভাদ্রের নদীর খরস্রোত ঠেলে চলে আসছে এ-পারে। তাদের সঙ্গে চকচকে হাঁসুয়া—ঝকঝকে লাঠি। পোটলায় বাঁধা চাল, গাটরিতে বাঁধা কাপড়। তাদের বলিষ্ঠ বাহুর বিক্ষেপে নদীর জলে যেন মন্থন সুরু হয়েছে।

পাঁচ হাজার লোক নদী সাঁতরে এপারে চলে এল। একদিনের মধ্যে তারা অন্য মানুষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার নতুন রক্ত নেচে উঠেছে—দুলে উঠেছে তাদের সর্বদেহে।

লালচাঁদ সামনেই দাড়িয়ে। তার জানোয়ারের মতো চোখ দু'টো বাঘের মত ভয়ঙ্কর। বললে, বলো ঠাকুরভাই, 'বন্দে মাতরম্'—

কাণা-ঠাকুর ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'বন্দে মাতরম্'—

—দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর পারানির পয়সা পাবে না তুমি।

কাণা-ঠাকুর জবাব দিলে না। বুকের মধ্যে বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। পাঁচ হাজার লোকের কাছে পারানির পয়সা চাইবার মতো সাহস তার ছিল না।

—সাত—

রেল ষ্টেশন।

যেখান দিয়ে দু'খানা মেলগাড়ী বেরিয়ে যায় ঝড়ের মতো দ্রুত বেগে। একখানা আসে আসামের পাহাড়ের বুকে ঘন-গর্জিত ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আর একখানা আসে হিমালয়ের লুপ ঘুরে ঘুরে। একখানা দিনে—একখানা রাত্রে। দিনের ট্রেণ থামে না—লোহার ঘূর্ণির মতো উড়ে যায়; আর নিশুতি রাতে কালপুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তিটা যখন উদয়াস্তের সীমারেখায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—রাত্রের ট্রেণখানা তখন শাণিত একটা আলোক-তীরের মতো এসে বিদ্ধ হয় এখানকার কাঁকর-ফেলা প্লাটফর্মের নীচে। এখানে ফার্স্ট-ক্লাস-ওয়েটিং-রুমের প্রসাধন-টেবিলে একখানা ময়লা তোয়ালে এবং এক টুকরো লাক্স্ সাবান সজ্জিত থাকে এবং সাহেবের আর্দালী তাই দিয়ে বিলাতী কুকুরকে স্নান করিয়ে ষ্টেশন-মাষ্টারকে কৃতকৃতার্থ করে দেয়। এখানে অন্ধকারের পটভূমিতে চালের কলের ছায়ামূর্তিগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ষ্টেশনের পেছনে খোলার ঘরের উড়িয়া-হোটেলে ইন্দুর বাবু নিদ্রামগ্ন। ময়লা মাদুর আর পুরোনো কেরোসিন কাঠের চৌকির ফাটল থেকে দলে দলে ছারপোকা বেরিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু ইন্দুর বাবুর শুকনো হাড়ের পাজা থেকে একবিন্দু রস তারা সঞ্চয় করতে পারছে না। মশারির ছিদ্রপথে ঢুকেছে এক ঝাঁক মশা—কিন্তু তাদেরও ওই দশা—নিরাশ হয়ে বেরুবার চেষ্টায় তারা মশারির কোণায় কোণায় ভন্-ভন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে ইন্দুর বাবু। সকাল হতে এখনো দু' ঘণ্টা দেরী—দু' ঘণ্টা পরে ভোরের বাস যাত্রা করবে নিশ্চিন্ত-নগরের পথে। ইন্দুর বাবু স্বপ্ন দেখছে, খোঁয়াড়ের মতো ঠাসাঠাসি-করা বাসের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে সে প্রাণপণ গলায় চীৎকার করছে: এই যে চলল বাস নিশ্চিন্ত-নগর—একদম খালি গাড়ি—

—শাট্ আপ্ স্টুপিড্। খালি গাড়ি! যে করে আমাদের গাদিয়েছ—তারওপরে আরো লোক ডাকছো। একবার হাতের কাছে এগিয়ে এসো না বাপধন—একটি বোম্বাই ঘুষিতে নাকটা চ্যাপ্টা করে দিই।

গাড়ির দরজার কাছে যে পাগড়ী-পরা প্রকাণ্ড জোয়ান লোকটা প্রায় শূন্যে ঝুলে ছিল, সে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে পেছন ফিরল।—ঠারিয়ে ঠারিয়ে বাবু—হাম্ দেখলা দেতা উস্‌কো—

—বাপরে—বলে ইন্দুর বাবু লাফিয়ে নামতে গিয়ে কোঁচায় পা বেধে আছাড় খেয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

নাঃ, বাস নয়—মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েনি সে। পাশের জানালা দিয়ে ঝাঁঝালো টর্চের আলো এসে তার চোখ-মুখ জ্বালিয়ে দিচ্ছে—শিখ-মোটর-সার্ভিসের ম্যানেজার আকালী সিং তাকে হেঁড়ে-গলায় ডাকছে: ইন্দুর বাবু—এ ইন্দুর বাবু—

শিথিল এবং বিস্রস্ত কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে ইন্দুর বাবু তড়াক করে উঠে বসল: কী হয়েছে পাঁইজী, এই রাত্রিতে ডাকাডাকি কেন?

—আরে উঠোনা জল্‌দি—

—বল্‌না বাপু কী হয়েছে! মাঝ-রাত্তিরে কী নরক-যন্ত্রণা রে বাবা।

—তুরন্ত্ বাহার আও। তিনঠো স্পেশ্যাল্ দিতে হোবে। নিশ্চিন্ত-

নগরে যো হাঙ্গামা হৈয়ে গিয়েছে, উস্‌কো ওয়াস্তে সরকারী ফৌজ আ্‌ গিয়া—

—অ্যাঃ—

ছেঁড়া টুইল-সার্ট আর চশমা পরে ইন্দুর বাবু বেগে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। খোয়া-ওঠা ষ্টেশনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিড়্‌ বিড়্‌ করে বকতে লাগল: ছেড়ে দেব এই ঘোড়ার ডিমের চাকরী। শালারা দেবে তো একুনে বাইশ টাকা আর খাটিয়ে নিচ্ছে যেন কলুর বলদ।

ষ্টেশনের পেছনে মিট-মিট করছে আলো। আর সেই অনুজ্জ্বল আলোয় চক্‌-চক্‌ করছে একরাশ উজ্জ্বল চাপরাশ—ঝক্‌-ঝক্‌ করছে কতগুলো রাইফেলের নল। ফৌজী বুটের শব্দে ষ্টেশনের কাঁকর আর্তনাদ করে উঠছে। সিংহের নখ-দন্ত।

কোমরে রিভল্‌ভার—আঁটা-সাঁটা ইউনিফর্ম-পরা সহরের এস্‌ পি সামনে এসে দাড়ালেন। তাঁর-তীব্র দৃষ্টি ইন্দুর বাবুর ইঁদুরের মতো শুকনো মুখের ওপর এসে পড়ল—সর্বাঙ্গে ভয়ের বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ইন্দুর বাবুর। মনে হল যেন নিশ্চিন্ত-নগরের হাঙ্গামার জন্যে তিনিও একজন অপরাধী, এখনি হয়তো এস্‌-পি হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন: পাকড়ো ইসকো।

ইন্দুর বাবু দাড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

এস্‌-পি বললেন, বাসের দেরী কত?

ইন্দুর বাবু শুকনো ক্ষীণস্বরে বললেন, এখুনি আসবে হুজুর।

—এক্ষুনি?—তা আসছে না কেন?—অন্ধকারের মধ্যে এক সারি উদ্ধত দাঁত যেন খিঁচিয়ে এল—তাড়া করে এল ইন্দুর বাবুর দিকে।

—আসবে স্যার। পেট্রোল নিয়ে ঠিক-ঠাক হয়ে আসবে তো—

—বেশি ঠিক-ঠাক করতে হবে না—আমাদের সময় নেই। এক্ষুনি

দৌড়ে যান মশাই—বাস যেমন আছে ওতেই চলবে। *অ্যাট্‌ এনি কস্‌ট্‌* —ভোরের আগেই আমাদের নিশ্চিন্ত-নগরে পৌঁছতে হবে—বুঝেছেন?

এস্‌-পি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ইন্দুর বাবুর কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন। সে ঝাঁকুনিতে ইন্দুর বাবুর হাড়-পাঁজরগুলো যেন একসঙ্গে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ করে বেজে উঠল।

—এই যে যাচ্ছি স্যার—

ইন্দুর বাবু প্রায় ছুটেই পালালেন সেখান থেকে। যেন মস্ত-বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেছে—আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন তিনি।

সাত-আট মিনিটের মধ্যেই হেড্‌-লাইটের তীব্র আলো ছড়িয়ে তিনখানা বাস এগিয়ে এল। এবার চীৎকার করে ইন্দুর বাবুকে লোক ডাকতে হল না—খালি গাড়ির আকর্ষণ দেখিয়ে কাউকে প্রলুব্ধ করবার দরকার হল না। চকচকে বুট আর ঝকঝকে রাইফেলের নলগুলো একে একে নিজেরাই বাসে উঠে বসল।

—ভোঁপ্‌ ভোঁপ্‌ ভোঁপ্‌—

পরক্ষণেই তিনখানা বাস ঘুমন্ত বন্দরকে সচকিত করে দিয়ে নক্ষত্র-গতিতে বেরিয়ে গেল। হাটখোলা পার হয়ে, তাঁতীদের বস্তি ছাড়িয়ে, মরা নদীর লোহার পুলটার ওপর দিয়ে পীচ-বাঁধানো পথে ছুটে চলল নিশ্চিন্ত-নগরের দিকে। অরাজক পুরীকে শায়েস্তা করতে হবে—বুঝিয়ে দিতে হবে যে—

ইন্দুর বাবু তখনো ষ্টেশনের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে।

আকালী সিং এসে আস্তে তার পিঠে একটা থাবড়া মারলে। ইন্দুর বাবুর পা থেকে মাথা অবধি একসঙ্গে কেঁপে উঠল।

—কে, পাঁইজী?

—অমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ইন্দুর বাবু!

—ভাবছি। এত ফৌজ কেন গেল পাইজী?

—লড়াই করতে।

—লড়াই! কার সঙ্গে লড়াই?

—দেহাতী লোকের সঙ্গে। যারা নিশ্চিন্ত-নগরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

—ওঃ! কিন্তু একটা জিনিস এখনো ইন্দুর বাবু বুঝে উঠতে পারছে না। দেহাতী মানুষ, যারা কখনো চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি—যারা চিরদিন মার খেয়েছে, পশুর মতো মরেছে; যাদের কাছ থেকে আট আনা ভাড়ার বদলে একটা টাকা আদায় করেছে সে, এবং একটি মাত্র ধমকেই যারা ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের নীচে শুয়ে পড়েছে—আজ তাদের এত শক্তি, এত আত্ম-বিশ্বাস দিলে কে? ম্যালেরিয়া আর অভাবের পীড়নে যারা শুধু মৃত্যুর জন্যেই দিন গুণেছে, আজ বাঁচবার এই অমোঘ মন্ত্র তারা পেল কোথায়?

আকালী সিং বললে, বাঙালির ওপরে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ইন্দুর বাবু।

ইন্দ্র বাবু জবাব দিলে না। নিজের মধ্যে যেন কী আশ্চর্য একটা অনুভূতি তাকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে! এই বাইশ টাকা মাইনের চাকরী—এই উড়িয়া-হোটেলে দিনগত পাপক্ষয়, রক্তচক্ষু যাত্রীদের ভয়ে তটস্থ থাকা—সকলের কাছে যোড়-হাতে ইহজন্ম আর পরজন্মের কৃত যা কিছু অপরাধের জন্যে সারাক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা। এ ছাড়া আরো কোনো কি অর্থ আছে জীবনের, আছে বৃহত্তর কিছু? ওই হঠাৎ জেগে

ওঠা দেহাতী লোকগুলোর মতো! তারও চেতনায় কি নতুন কোনো সূর্যের প্রসন্ন একটা আলোক-দীপ্তি এসে পড়বে?

বাসের শব্দ মিলিয়ে গিয়েছে দূরে। কিন্তু ওই বাস আর কত দিন চলবে অমন করে! সব পথই কি চিরদিন সমান মসৃণ থাকে! দুর্যোগ আসে, নানা বিঘ্ন-বিড়ম্বনা আসে, অপঘাত আসে—কত গাড়িতে কত দুর্ঘটনা হয়। নিশ্চিন্ত-নগরের পীচ-বাঁধানো মসৃণ রাস্তায় কখনো কি শোচনীয় একটা অ্যাক্সিডেণ্ট্ ঘটতে পারেনা, অন্তত লোহার পুলটা ভেঙে দু'-একখানা বাস আছড়ে পড়তে পারেনা—পড়ে চুরমার হয়ে যেতে পারেনা—পঞ্চাশ ফুট নীচে ওই মরা নদীর গর্ভে?

রাত্রি ভোর হয়ে আসছে। মিটমিটে আলোগুলো নিবে আসছে চারদিকে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইন্দ্র বাবুর শরীর শিরশির করতে লাগল—কপালের ওপর কোথা থেকে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল এসে পড়ল—শিশির। ভো-ও-ও। চালের কলের প্রথম বাঁশি বাজল—কালো ফানেলের মুখে ধক-ধক করে বেরুল খানিকটা ধোঁয়া। ঘট্-ঘট্-ঘটাং। ষ্টেশনে সিগন্যালের শব্দ—একটা গুড্স্ ট্রেণ আসছে।

যাত্রীদের মধ্যে দু'-একজন করে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এল।

—ও মশাই, নিশ্চিন্তনগরের বাস ছাড়বে কখন?

—ঠিক নেই। তিনখানা গাড়ি চলে গেছে ফৌজ পৌছে দিতে, তারা না এলে কোন গাড়ি সহরে যাবে না। যান্ যান্, চুপ করে পড়ে থাকুনগে।

মনের মধ্যে একটা অকারণ অস্বস্তি। চোখের সামনে কতকগুলো রাইফেলের নল যেন এখনো ঝক্-ঝক্ করে উঠছে। ইন্দ্র বাবু আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে চলতে সুরু করে দিলে। মরা রক্তে কখনো কি সূর্যালোক পড়ে—জোয়ারের উচ্ছ্বাস কি গর্জে ওঠে কোনো দিন?

—আট—

তারপরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ভাতার-মারীর মাঠ; মরা দীঘির উচুঁ পাড়ি আর টিলার নীচে এক সংগ্রামের রক্তাক্ত-স্বাক্ষর রয়ে গেল। জ্বলে-যাওয়া গ্রাম আর মরা-মানুষের ভাঙা-পাঁজরে যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রইল তা উদ্ধার করবে অনাগত কালের প্রত্নতাত্ত্বিক, স্বাধীন-ভারতের ঐতিহাসিক। এখানে তা লেখবার অধিকার নেই। এই আখ্যায়িকায় যে ফাঁক রয়ে গেল তা পূর্ণ হয়ে উঠবে সেইদিন, যেদিন দু'শো বছরের শৃঙ্খল দু-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে—যেদিন বন্দী-শালার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে ভাবী ভারতের দেশ-নায়ক।

খবরের কাগজে বহুদিন পরে সেন্সারের ছাপ-মারা যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে জানা যায়ঃ "সশস্ত্র পুলিসের সহিত জনতার সংগ্রামে চারিজন নিহত ও বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে।" নিশ্চিন্ত-নগরে যাদের চোখের সামনে গোরুর গাড়িতে করে লাশের চালান এসেছে—এই খবরে একটুখানি বিষণ্ণ হাসি মাত্র হেসেছে তারা। যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার পক্ষে এ অপরিহার্য প্রয়োজন, সুতরাং নীরব থাকাই ভালো।

তবু সান্ত্বনা আছে তাদের—। যাদের সামনে পথ ছিল না, যারা শুধু নতুন সূর্যের আলোতেই প্রাণ পেয়েছিল, প্রেরণা পেয়েছিল, তাদের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তের ছাপ আর পুড়ে-যাওয়া ঘরের কালো কালো খুঁটিগুলো দিক-নির্দেশক হয়ে রইল আগামী কালের সৈনিকের জন্যে।

রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই—এ-বাণী কবির নয়, দার্শনিকের নয়, মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষেরই।

তিন চার দিন পরে একটু একটু করে ধাতস্থ হয়ে উঠছে নিশ্চিন্ত-নগর। আর দুর্ভাবনার কারণ নেই কিছু। ইংরেজ-রাজত্ব সত্যিই খানচান হয়ে যায়নি। ধর্মরাজ্যে আবার শান্তি-প্রতিষ্ঠা হয়েছে—সরকারী ফৌজ নিমকের গুণ ভোলেনি।

সকালের আলোয় আবার আড্ডা বসেছে ক্লাবের বারান্দায়। তেমনি করেই আকাশের কোণে ঘনিয়ে আছে এক রাশি মেঘ। পূবের বাতাস বয়ে যাচ্ছে—লোহার পুলের তলা থেকে আসছে জলের কলরোল। শালের কচি রাঙা পাতায় মর্মর বাজছে। বড় বড় কদম গাছ দুটোর পাতা দেখা যায় না, সংখ্যাহীন অগণ্য নীপমঞ্জরী রোমাঞ্চিত আনন্দে গন্ধের মদিরতা বিকীর্ণ করে দিয়েছে।

খবরের কাগজ এসেছে। তার পাতায় পাতায় বিক্ষোভের বিবরণ। এখানে আগুন জ্বলেছে, ওখানে গুলি চলেছে। প্রলয়ের ঘূর্ণি বয়ে যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কিন্তু নিশ্চিন্ত-নগর আজ যেমন শান্ত নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে, কাল সমস্ত ভারতবর্ষও তেমনি নীরব নিশ্চিন্ততায় ঘুমিয়ে পড়বে। জেগে থাকবার দরকার নেই—দিবাস্বপ্নই ভালো—সত্য এবং সার্থক! শুধু কারাগারের অন্ধ বন্ধন যাদের প্রাণকে বন্দী করতে পারেনি—বুকের পাঁজরে মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তারা প্রতীক্ষা করে আছে। তারা স্বপ্ন দেখেনি—প্রসারিত উজ্জ্বল ভবিষ্য-দৃষ্টিতে আগামী কালকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে।

সত্যিই কি ভারতবর্ষ আবার ঘুমিয়ে পড়বে? যে আগুন জ্বলেছিল

—তার শিখা একেবারেই নিভে যাবে চিরদিনের জন্যে! হয়তো আজ পথ ভুল হয়েছে—কিন্তু পথ চলার প্রেরণা কি সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে। ভুলের মধ্য দিয়েই তো সত্যের রূপ ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে—অনেক ব্যর্থ আত্মবলির অবসানে সাধনা সার্থকতার জয়মাল্য লাভ করে।

কিন্তু সে ভাবনা ভাববার দায় রমাপদ বাবু, কালীসদন বাবু, পূর্ণ বাবুর নয়। আদালতের কাগজ-পত্র পুড়ে গেছে—ছাত্রেরা ইস্কুলে আসেনা; কিন্তু সে ক'দিনের জন্যে! আবার সব সহজ হয়ে যাবে। মামলা চলবে, মোকদ্দমা চলবে, ব্যবসা চলবে—অধ্যয়নের তপস্যার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা সরস্বতীর প্রসাদ লাভ করবে। শান্ত—নিশ্চিন্ত—নিরুদ্বিগ্ন ভারতবর্ষ, মনু-পরাশর-বেদব্যাসের সোনার ভারতবর্ষ।

রমাপদ বাবুর মনটা খুশি আছে। তিনি সোজা গিয়ে এস্-ডি-ওর কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে করুণা ভিক্ষা করেছেন। এস-ডি-ও আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তিনি দেখবেন। সন্ধ্যা সাবালিকা—তার দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ ভাবে রমাপদ বাবুর নয়।

খবরের-কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে রমাপদ বাবু বললেন, দেখলেন সি-পির ব্যাপারটা! উঃ, কী কারবারই করেছে!

পূর্ণ বাবু পান চিবুতে চিবুতে বললেন,—ও আর কী দেখবেন! নিজের চোখে এখানেই তো সব দেখলেন।

কালীসদনের কলিকের ব্যথা উঠেছিল পেটে। একটা হোমিও-প্যাথিকের পুরিয়া মুখে ঢেলে দিয়ে বিকৃত মুখে তিনি চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙল।

—গেঁয়ো লোকগুলোর সাহস দেখলেন? ব্যাটারা কোনো দিন

সাত-চড়ে রা করতে জানে না—হঠাৎ কী কাণ্ডটাই বাধিয়ে দিয়ে গেল।

রমাপদ বাবু সোৎসাহে বললেন : তেম্‌নি শিক্ষাও হয়েছে বাছাদের। রাইফেলের মুখে সব ঠাণ্ডা। রঙীর ওপারে ভাতারমারীর মাঠের আশে-পাশে যে সব গ্রাম ছিল সব একেবারে স্ম্যাক্‌ড্‌ হয়ে গেছে। ওদিক্‌ থেকে যারা আসছে তারা বলছে, আর কিছু নেই—পুড়ে সব শ্মশান!

পূর্ণ বাবু বললেন, বেশ হয়েছে! পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার জন্যে। আরে বাপু, দেশ স্বাধীন করতে হবে! কিন্তু তা দিয়ে তোদের কোন দায়টা পড়েছে! দেশে এত বড় বড় নেতা আছেন, এত কর্মী আছে—তাদের বাদ দিয়ে তোরাই স্বাধীন-ভারত তৈরী করবি নাকি! চাষা আছিস—চাষাই থাক—তা নয়—একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়লি আগুনের মধ্যে! এখন ঠ্যালা সামলাবে কে? ধনে-প্রাণে গেল তো সব!

কালীসদন পেট চেপে ধরে বললেন, এই ব্যাটা লালচাঁদ মণ্ডল। চিরদিন ওদের নাচিয়ে এসেছে। কাউকে পরোয়া করে না, আদালতে সেদিন আমাকে যা-নয় তাই বলে গেল। এখন ঠিক হয়েছে—বুকে দুটো বুলেটের ফুটো নিয়ে পড়ে আছে লাস-কাটা ঘরে! ছোট জাতের বুদ্ধিই এই রকম।

রমাপদ বাবু কাগজের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বললেন : ওরে বাপরে—সব জায়গাতেই এক খবর। এই যে নাগপুরে—নাঃ মশাই আর ভালো লাগে না সব পড়তে।—কাগজটাকে টেবিলের একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে রমাপদ বাবু বললেন : ওদের দোষ দিচ্ছেন কী—দোষ তো ভদ্রলোকের ছেলেদেরই। ওই ব্রজেন—ওই বাচ্চা ছেলে প্রমোদ—চোখের সামনে তো দেখলেন। ওরা যা বললে, লোকগুলোও তাই করলে!

কালীসদন খানিকটা আশ্বস্থ হয়ে উঠেছেন : আঃ, বিনোদ বাবুর যা অবস্থা। ভদ্রলোক এখনো বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না—প্রলাপ বকছেন। ওই টুকু ছেলের পেটে যে অত বিদ্যে আছে কেউ বুঝতে পেরেছিল মশাই ?

রমাপদ বাবু সরোষে বললেন, আর ওই ইস্কুল-মিস্ট্রেস পূরবী দাশগুপ্ত! আমার সর্বনাশটা করে তবে ছাড়লে। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আর কোনো আশা নেই। আচ্ছা, ব্রজেন—প্রমোদ, ওরা কি সব ধরা পড়েছে ?

—নাঃ, অ্যাবস্‌কণ্ড্ করেছে সব। কালীসদন জবাব দিলেন : কিন্তু ক'দিন থাকবে লুকিয়ে। ইংরেজের তো বাবা চোখ নয়, সহস্র-লোচন। এমদাদ হোসেন সাহেব উঠে পড়ে লেগেছেন। ক' দিন পরেই দেখবেন কোমরে দড়ি পরে সব সুড়-সুড় করে এসে হাজির হয়েছে। তা ছাড়া রিওয়ার্ডের ব্যবস্থাও হয়েছে ধরে দিতে পারলে।

—হুঁ।—পূর্ণ বাবু হঠাৎ নিজের মধ্যে দেশাত্মতার একটা প্রেরণা অনুভব করলেন : কিন্তু যাই বলুন, বুকের পাটা আছে স্বীকার করতেই হবে। নিজের জন্যে তো কিছু করেনি—যা করেছে দেশের কল্যাণে। ত্যাগের একটা মূল্য তো দিতে হবে।

কালীসদন তেড়ে উঠলেন : আরে রাখুন দাদা ত্যাগ আর ফ্যাগ। এদিকে কী হচ্ছে খবর রাখেন ? আদালত-কাছারী আপনারা পোড়ালেন, তার কোনো খেসারত দিতে হবে না, ভেবেছেন ? এমনি এমনিই ছেড়ে দেবে ? মোটেই নয়। আমি এস-ডি-ওর ওখানে শুনে এলাম কালেকটিভ ফাইনের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

—কালেক্‌টিভ ফাইন!

—নির্ঘাৎ। পঁচাত্তর থেকে আশী হাজার টাকা উশুল করা হবে এই ছোট সহর আর আশ-পাশের গ্রাম থেকে। সকলের ট্যাঁকেই টান পড়বে—কোনো শর্মাই তার হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

—বলেন কি মশাই ?

—যা বলছি তা পাকা কথা। ত্যাগ! এই বারে বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়।

সমবেত ভদ্রমহোদয়ের মুখ এক সঙ্গে কাল হয়ে গেল। রমাপদ বাবু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন: আর ফাইন না দিলে ?

—ঘটি-বাটি নীলাম করে আদায় করে নেবে। এ বাবা আইন।

আইন! তা বটে। কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

এককোণে চুপ করে বসে ছিল গুরদিৎ সিং। কোনো কথা সে এতক্ষণ বলেনি—বলবার প্রেরণাও তার ছিল না। এই ক'দিনেই মনের মধ্যে আশ্চর্য রকম বদলে গিয়েছে সে। দুদিন আগে যখন গ্রাম থেকে একদল লোককে ধরে এনে গুরদিৎকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এদের মধ্যে কে কে তার গ্যারেজ পুড়িয়েছে এবং এদের কাউকে সে চিনতে পারে কিনা, তখন সে সোজা জবাব দিয়েছে: না এদের কাউকে সে চেনে না।

গুরদিৎ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। এমন শব্দ করে থুথু ফেললে যে সকলে একসঙ্গে চমকে উঠল।

—ব্যাপার কী সিংজী, গলায় কী ঢুকল ?

—পচা গন্ধ ঢুকেছে—ঘৃণা-বিকৃত মুখে গুরদিৎ বললে, আপনারা বসুন, আমি চললাম। দীর্ঘদেহ শিখ নেমে পড়ল বারান্দা থেকে—কাঁকরের রাস্তা দিয়ে উদ্ধত পদক্ষেপণে হেঁটে লোহার পুলটা পার

হয়ে। আর এখানকার সকলে বিহ্বলভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল—স্লিংজীর ব্যবহারের মধ্যে কিছু একটা সন্দেহ করেছে তারা।

এডিথ বারান্দায় আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল ডেকচেয়ারে। পাশে চেয়ারের হাতায় আনোয়ার চা দিয়ে গেছে—অর্ধজাগ্রত চেতনার মধ্যে চায়ের মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছিল এডিথ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সত্যি—কিন্তু শরীরে এমন প্রেরণা পাচ্ছেনা যে নিদ্রাজড়িত চোখ খুলে হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় সে চুমুক দেবে।

কাল সারাটা রাত কেটে গেছে দারুণ একটা যেন দুর্যোগের মধ্যে। নিশ্চিন্ত-নগরে এত কাণ্ড ঘটেছে—এত রাজনৈতিক সংঘাত—গুলি চলল, এতগুলো মানুষ জেলে চলে গেল—কিন্তু নিজের কাজ ছাড়া কোনো দিকে তাকাবার সময় এডিথের ছিলনা। হরিহর তরফদারের বউটাকে নিয়ে কাল রাত্রে যমে-মানুষে টানাটানি গেছে। পঞ্জিকার পাতা থেকে সংগৃহীত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ওষুধ মেয়েটার শরীরে অমোঘ কাজ দেখিয়েছে। যে পরিমাণ হেমারেজ হয়েছে তাতে শেষ পর্য্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ—অক্সিজেনের ওপরেই আছে এখনো। সারদা বাবুর আহ্লাদী মেয়ের কপালেও ওই রকম দুর্যোগ অনিবার্য—এ সম্বন্ধে এডিথ প্রায় নিশ্চিত।

কিন্তু কী ইডিয়ট ওই ল্যাগবেগে হরিহরটা! কাছা-কোঁচা সামলে চলতে পারে না, অথচ এ সব বুদ্ধি বেশ আছে। লোকটাকে কষে একটা চড় বসানোর জন্যে ওর হাতটা নিস্‌পিস করছিল—বহু কষ্টে মনের সে হিংস্র উত্তেজনাটাকে ও সামলে নিয়েছে। এত আইন হয়, অথচ এই সব হাতুড়ে ওষুধ-ওয়ালাদের ফাঁসিতে লটকাবার জন্যে একটা আইন

করতে পারে না কেউ! ইণ্ডিয়া-ডিফেন্স-অ্যাক্ট, একশো-চুয়াল্লিশ-ধারা, অ্যামেণ্ডমেণ্ট-অ্যাক্ট, পাঁচ-আইন—সরকারের-দাক্ষিণ্য-প্রসারিত বাহু এ ক্ষেত্রে এমন কৃপণ কেন!

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এডিথ আর একবার বেগে উঠবার চেষ্টা করলে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝিমিয়ে পড়ল সর্বাঙ্গের একটা স্থানীয় জড়তা আর শ্রান্তির শিথিল আচ্ছন্নতায়!

—রেখা!

—কে?

মুহূর্তে এডিথের আচ্ছন্নতা দূর হয়ে গেল। রেখা! এ নামে তাকে কে ডাকে।

—রেখা! ঘুমুচ্ছ?

এবার আর চোখ-কানকে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই। সামনে পরিচিত মুখ, সেই পরিচিত হাসি! টকটকে ফরসা রঙ—একটি দীপশিখার মতো ক্ষীণ-দেহ উজ্জ্বল মানুষ!

—প্রভাস!

মুহূর্তে রেখা প্রভাসের বুকের মধ্যে ভেঙে পড়ল।

কয়েক মিনিট কেটে গেল ঘনীভূত খানিকটা অনুভূতিমগ্ন স্তব্ধতায়। আস্তে আস্তে রেখা প্রভাসের বাহু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। বললে: তুমি কী করে এলে?

—যেমন করে সবাই আসে। ট্রেণে, তারপরে মোটরে—তারপরে হেঁটে। জানতাম এখানে তুমি আছো—খুঁজে নিতে কষ্ট হল না।

উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে রেখার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে বললে: বসো, চা খাও বিশ্রাম করো।

সাতদিনের মধ্যে তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না, এই বলে রাখলাম।

প্রভাস কোমল গলায় বললে,—পাগল! আজকের দিনটাও যে থাকতে পারবো না। বড় জরুরি কাজ। আমাকে যেতে হবে গ্রামে ভাতারমারীর মাঠের ওপারে।

ওঃ!—রেখার সমস্ত উজ্জ্বল উল্লাসের ওপর ঠাণ্ডা একটা ভারী চাপ এসে পড়ল যেন। প্রভাস তার কাছে আসেনি—এসেছে আপনার কাজে। রুদ্র সন্ন্যাসীর তপস্যা এখনো শেষ হয়নি—এখনো আসন্ন হয়নি ঘর বাঁধবার মধুমাস। আর কত দিন, কতদিন এই অনাসক্ত-বৈরাগীর পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করবে রেখা!

—আজই যাবে?

—আজই যেতে হবে।

কিন্তু ওখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেছে। চূড়ান্ত রিপ্রেশন হয়েছে—মানুষগুলো যেন পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে রয়েছে। কী করবে ওখানে গিয়ে?

—এই তো কাজের সময়। এখন গিয়েই তো ওদের বলতে হবে বিশ্বাস হারিয়ো না। যা হারিয়েছ, যা ত্যাগ করেছ—যতখানি রক্ত দিয়েছ—তার ঋণ একদিন শোধ করবেন বিশ্বের ভাণ্ডারী। কিন্তু ভুল করেছিলে ভাই—বিপথে গিয়েছিলে। আত্মস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও। বিপ্লবের প্রদীপকে নিবিয়ো না—বুকের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে রাখো—ঐক্যবদ্ধ হও—শক্তি অর্জন করো। আকস্মিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয়—গণসংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হও।

—কিন্তু তোমার স্বপ্ন কি সার্থক হবে প্রভাস?

—স্বপ্ন তো দেখি না রেখা। যা অনিবার্য তাকেই দেখি। বাঁধ যখন ভেঙেছে তখন তাকে ঠেকাবার সাধ্য আর কারো নেই। কিন্তু কূল-ভাঙা দিক-ছাড়া বন্যা নয়—তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—তাকে পথ দেখাতে হবে। ইতিহাস আর পৃথিবী যে পথে চলেছে সেই বৈজ্ঞানিক পথ তাকে অনুসরণ করতে হবে। যা স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে রূপ পেয়েছিল—যুক্তির সত্য দিয়ে তাকে ফলবান্ করতে হবে। এর মধ্যে স্বপ্ন নেই—সুনিশ্চিত বাস্তবতা আছে।

প্রভাস চুপ করল—রেখা চুপ করে রইল। প্রভাসের সমস্ত মুখখানা জ্বলছে—দীপ-শিখার মতো। উজ্জ্বল দীর্ঘদেহে অনাগত সার্থক দিনের যেন আনন্দময় প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে। কিন্তু তবুও রেখা খুশি হয়ে উঠতে পারছে না—চোখের কোণ দিয়ে তেমনি অশ্রুর বিন্দু গড়িয়ে আসছে। আর পারে না সে—আর পারে না। এই স্বাধীন জীবন—এই নিঃসঙ্গ পথ-যাত্রায় সে ক্লান্ত। কিন্তু রুদ্র সন্ন্যাসীর তপস্যা শেষ হবে কবে? কবে আসবে মিলনের মধু-মাস! সে কি অনাদি আর অনন্ত কালের পরে?

* * * * *

মহকুমা-সহরের দুটি প্রবেশ পথ।

নীচের রাস্তা দিয়ে চলেছে বাসের পর বাস: আর্মড্-ফোর্সের আনাগোনা—রাজবন্দীদের নিয়ে চলেছে লরী। আসছে অফিসার—অভিজাত—সহরের বাসিন্দা। আসছে বোম্বাই-দিল্লী-কোলকাতার মানুষ; আরো দূরের জগত—ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বার্তা আসছে রয়টারে! মসৃণ পথ, সমতল পথ—নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত জীবন।

আর রঙীর খেয়া পার হয়ে, কাণা-ঠাকুরকে পারানির পয়সা গুণে দিয়ে ভাতারমারীর মাঠের দিকে হেঁটে চলেছে প্রভাস। পিঠে একটা ছোট থলি—হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে লাল ধুলো। পঙ্কিল অসমতল রাস্তা—জনহীন দিক-প্রান্তর, টিলার ওপরে তালগাছের মাথায় শকুনের পাল। বাতাসে যেন এখনো ভাসছে বারুদের একটা মিষ্টি আর উগ্র গন্ধ।

পশ্চিম প্রান্তে রক্ত-রঙীন দিনান্ত। আকাশ যেন লালচাঁদ মণ্ডলের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তে লাল।

রচনাকাল:
ভাদ্র, ১৩৫২